
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন

মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ তাপস মণ্ডল

MAJHE MATRO CHOBBISH DIN
by Abhijnan Roychowdhury
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-239-9

যাঁদের উৎসাহ আমাকে
সৃষ্টির স্বপ্ন দেখায়,
আমার কলমকে থামতে দেয় না
সেই দুইজন
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
চুমকি চট্টোপাধ্যায়
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

অনিলিখাকে নিয়ে প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস সংকেত রহস্য। বেরিয়েছিল ২০০৮ সালে, শারদীয়া কিশোর ভারতীতে। তারপর প্রতিবছর কল্পবিজ্ঞান নির্ভর উপন্যাস লিখে গেছি শারদীয়া কিশোর ভারতীতে।

অবাক হয়েছি প্রত্যেকটা উপন্যাসকে ঘিরে পাঠকদের আগ্রহ-উন্মাদনা দেখে। অবাক এই কারণেই যে ভূত আর গোয়েন্দারা চিরকালই বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয়। সেখানে কল্পবিজ্ঞানকে নিয়ে এই উৎসাহ। অনিলিখাকে ঘিরে এই অপেক্ষা। পাঠকদের এই ভালোবাসায় আমি সত্যি অভিভূত।

এই বইতে আমার দুটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে 'রহস্য যখন রক্তে' ও 'মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন'। শারদীয়ায় প্রকাশিত দুটি উপন্যাসই অনেকাংশে পরিবর্ধিত। কারণ শারদীয়ায় পাতার যে শাসন থাকে তার থেকে বই-তে তারা মুক্ত। তাই যারা পড়েছেন, তাদেরকেও বলব আবার পড়তে।

একইসঙ্গে বিজ্ঞান, অ্যাডভেঞ্চার ও কল্পনা মিলেমিশে গেছে দুই উপন্যাসে। ঘটনা কখনও ভারত ছেড়ে আমেরিকায় তো, কখনও বা সুমাত্রায়। এরই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হয়েছে সেসব কিশোরদের কথা, যারা আজকাল বাংলা বই পড়ে না। একবার পড়তে শুরু করলে যাতে শেষ না করে ছাড়তে না পারে, সেই চ্যালেঞ্জটাকে লেখক হিসেবে নিতে হয়েছে। বিচার আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

অনেক যত্ন করে এই বইটি আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে যে দুজন প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন, সেই ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্র ভারতীর সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীকে, যারা খুব সুন্দরভাবে বইটির প্রযোজনা করেছেন। সবশেষে আগ্রহী পাঠক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের উৎসাহ ছাড়া এ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

২৮ নভেম্বর ২০১৩

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

সংকেত রহস্য
গ্লোবাল ওয়ার্মিং
রহস্য যখন ডারউইন
মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন

সূচিপত্র

রহস্য যখন রক্তে



১

এই—এই যে পাঁচ। আর এই দ্যাখো, শেষ সাপটা টপকালাম। এবার দুই পড়লেই উঠে যাব।

—দেখো, তবু আমিই জিতব। আমি আগে ওখানে পৌঁছে যাব।

—আচ্ছা সোনা, ঠিক আছে, তুমি-ই জিতবে। তুমি সবসময় জিতবে। পিকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় জয়ন্ত।—এবার তোমার দান।

পিকু মিনিট খানেক ধরে বেশ নেড়েচেড়ে দান ফেলে। ছক্কাটা টালমাটাল করে দুই-এ এসে দাঁড়ায়।

—যা:, একেবারে সাপের মুখে—সাপটা আবার খেয়ে নিল।

—না—আমি আর খেলব না। ছক্কাটা দূরে ছুড়ে ফেলে উঠে পড়ে পিকু। ছুটে শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে। খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর জোরে কেঁদে ওঠে। পিকু যখন কাঁদে তখন কান পাতা দায়। এত জোরে কাঁদে যে আগে আশপাশের বাড়ি থেকে সবাই খোঁজ নিত কী হল?

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে পিছু নেয়। ঘরে ঢুকে খাটের ওপর পিকুর পাশে শুয়ে পড়ে, ভোলানোর চেষ্টা করে।

—সোনা, এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়তে নেই। হয়তো ওই সাপটা পেরিয়ে তুই আমার আগেই উঠে যেতিস! আমার তো দুই পড়েই না!

পাঁচ বছরের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে জয়ন্ত আদর করতে থাকে। কিন্তু অত সহজে পিকু ভোলার নয়। আশা করেছিল অন্তত এবার জিতবে। আর বাবাটাও দুষ্টু। কেমন করে অত বড় সাপগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল! পিকুর লাকটাই খারাপ। বারবার ওই পঞ্চাশের আর বিরাশির বিচ্ছিরি সাপগুলো গিলে খায়। এর পরেরবার ও তবেই সাপলুডো খেলবে যদি তাতে ওই বিচ্ছিরি সাপগুলো না থাকে।

—সোনা, সব খেলাতেই হারজিত হয়। তাতে এত কাঁদে না। পরেরবার হয়তো তুমি জিতবে। জয়ন্ত বলতে থাকে—তুমি আইনস্টাইনের কথা শুনেছ?

দূর থেকে বিতানের গলা আসে,—আচ্ছা ও আইনস্টাইনের কথা কী করে জানবে? কাকে যে কী বলো!

—বাহ, আইনস্টাইনের কথা জানবে না?

—ঠিক আছে বাবা, তুমি আইনস্টাইনের কথা বলো। পিকু বাবার পক্ষ নেয়।

—উনি ছিলেন খুব বড় বিজ্ঞানী। এই যে তুমি রিমোট দিয়ে টিভি চালাচ্ছ, ফ্যান ঘুরছে, মা মাইক্রোওয়েভে রান্না করছে, তুমি ছোট ছোট খেলনার গাড়ি নিয়ে খেলছ, আমি কম্পিউটারে কাজ করছি—সবই কিন্তু বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। আর আইনস্টাইন ছিলেন একজন খুব বড় বিজ্ঞানী।

—বাবাই, আমাদের যে গাড়িটা আছে সেটাও কি আইনস্টাইনের বানানো?

হেসে ওঠে জয়ন্ত,—না তা নয়, বিজ্ঞানীরা যে সবসময় নিজে বানান তা নয়, কীভাবে করা যায় তা বলেন। আর সবাই তো সবকিছু আবিষ্কার করেন না।

—আচ্ছা তোমার চশমাটাও কি বিজ্ঞানীদের তৈরি?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বাবাই, আমাদেরও কি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন?

—না, তা নয়। বলে খানিকক্ষণ থেমে থাকে জয়ন্ত।—হয়তো পরে তাও হবে। বিজ্ঞানীরাই তৈরি করবে।

—বাবাই, ঠাকুররা তাহলে কী করেন? ঠাম্মা যে বলে সব ঠাকুররা করেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,—আমরা ঠিক করছি না ভুল করছি তা ঠাকুররা বলে দেন। জানো তো, আইনস্টাইন মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আমি জীবনে একটাই ভুল করেছি আর সেটা হল অ্যাটম বোম নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটা চিঠি লেখা।' ওই একটা চিঠির

জন্যই বিশাল একটা অ্যাটম বোমা তৈরি হয়। জাপান-এর দুটো আস্ত শহর তার জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।

—বাবাই, ওই বোমাটা কি আইনস্টাইন তৈরি করেছিলেন?

—না রে, আইনস্টাইন খুব ভালো লোক ছিলেন। উনি কখনও ভাবেননি যে ওনার আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে ওরকম একটা মারাত্মক বোমা তৈরি করা হবে।

—জানো তো, আমারও এরকম একটা সমস্যা হয়েছে।

—কীরকম? তোর আবার কী সমস্যা?

—দীপুকে চেনো? ও খুব দুষ্টু। আমি মাটি আর ইটের টুকরো দিয়ে একটা বল তৈরি করেছিলাম। ও সেটাকে ছুড়ে রুজুদের কাচের জানলা ভেঙে দিয়েছে কাল।

—সে কী? মাকে বলেছিস?

—নাহ, আমরা পালিয়ে এসেছি। ওরা দেখতে পায়নি। আর রুজু আমাকে কাল খেলতেও নেয়নি। ভালোই হয়েছে।

—বিতান, ও বিতান, শুনেছ? জয়ন্ত ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে যায়,—কাল পিকুরা রুজুদের কাচের জানলা নাকি বল দিয়ে ভেঙে দিয়েছে!

২

—হ্যালো—বিতান বলছি—হ্যালো...

রিং হতে বিতান এসে ফোন ধরেছিল। উলটোদিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। কীরকম একটা ঘ্যাসঘেসে আওয়াজ।

আরো খানিকক্ষণ উত্তর না পেয়ে বিতান ফোনটা রেখে আবার রান্নাঘরে এসে ঢোকে। জয়ন্ত অফিসের কাজে বাইরে গেছে। আসবে আরও দশদিন পরে। এ ক'দিন রান্নার বিশেষ ঝামেলা নেই। তবু একটা কিছু তো তৈরি করতে হবে। আজও রান্নার লোক আসেনি।

ফোনটা আবার বাজছে।

—দেখতো সোনা, কার ফোন। রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে বিতান।

টিভিতে টম অ্যান্ড জেরি ছেড়ে ছুটে এসে ফোন ধরে পিকু।—হ্যালো, আমি পিকু বলছি।

ওদিক থেকে কারও কথা শুনতে পায় না।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে পিকু। বলে,—মা, কেউ কিছু বলছে না।

—অ্যাই, কে না জেনে ফোনে ওরকমভাবে কথা বলে না। দাঁড়া, আমি ধরছি।

বেরিয়ে এসে বিতান ফোনটা ধরে,—হ্যালো, কে? শোনা যাচ্ছে না। কান্ট হিয়ার ইউ।'

ফোনের উলটোদিকে তবু নীরবতা। পুরো নীরবতা নয়, পিছন থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেন অনেক দূরে কেউ ফোনে কথা বলছে।

—হ্যালো? বিরক্ত হয়ে আরও মিনিট দুয়েক ধরে থেকে ফোন ছেড়ে দেয় বিতান। ছেড়েই মনে হয় ফোনটা জয়ন্তর নয় তো?

জয়ন্ত আমেরিকায় পৌঁছে একটা নতুন ফোন নাম্বার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম্বারে ফোন করে বিতান। ফোনটা সুইচড অফ। অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক সময়েই জয়ন্ত সেলফোন চার্জ করতে ভুলে যায়। আর তা ছাড়া এখন ভারতে বিকেল চারটে, অর্থাৎ নিউইয়র্কে সকাল সাড়ে ছ'টা। এসময় হয়তো ফোনটা ইচ্ছে

করেই অফ করে রেখেছে, যাতে কেউ বিরক্ত না করে, আচ্ছা, আজকেই তো ওর নিউইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট যাওয়ার কথা। মর্নিং ফ্লাইটে। ও তাহলে এখন ফ্লাইটেই আছে। আর তাই ফোন সুইচড অফ।

আজকে পিকুর ছুটি ছিল। অত্যধিক গরম পড়ায় স্কুলে ছুটি দিয়েছে। এবারে কলকাতায় গরমটা খুব বেশি মাত্রায় পড়েছে। পিকু একটা ছবি আঁকতে বসেছে।

—মা, বাবাই কবে আসবে?

—আচ্ছা, তুই রোজ একই প্রশ্ন করিস কেন বলতো? কালকেই তো বললাম, দশদিন পর।

—তার মানে আজকের পরে ঠিক ন'দিন?

—হ্যাঁ, তুই একটা কাজ কর। ক্যালেন্ডারে লিখে রাখ। বাবাইকেও তো রোজ এক প্রশ্ন করিস।

—জানো তো বাবাই সেদিন বলল যে বাবাই নাকি সায়েন্টিস্ট। সত্যি বাবাই সায়েন্টিস্ট? আইনস্টাইনের মতো?

হেসে উঠল বিতান,—বাবাই হল ইঞ্জিনিয়ার—সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সায়েন্টিস্ট ঠিক নয়। তোর সঙ্গে মজা করেছে। তা আজ সকালে অত কী কথা হচ্ছিল বাবাই-এর সঙ্গে ফোনে? রাতেও বাবাইকে ঘুমোতে দিসনি!

—বাবাই আমাকে অনেক গল্প বলছিল। বলছিল একটা যুদ্ধের কথা। অর্জুন বলে একটা রাজা যুদ্ধ করতে চাইছিল না। তা কৃষ্ণ ঠাকুর নাকি ওকে বলেছিল যে সবই তো আগে থেকে ঠিক করা আছে। ও যুদ্ধ করুক না করুক তাতে কিছু আসে যায় না।...মা, এটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ, মহাভারতের কথা। আমি একদিন গল্পটা পড়ে শোনাব।

—না, তুমি গল্প বলতেই পারো না। তুমি বললে দু-মিনিটেই গল্প শেষ হয়ে যায়। বাবাই কী সুন্দর গল্প বলে! আমি বাবাই-এর কাছে শুনব।

জয়ন্তর সত্যি ধৈর্য আছে। আর ছেলেকে এত ভালোবাসে আর সময় দেয়! যত ব্যস্তই থাকুক, ঠিক সময় বার করে ওর সঙ্গে খেলবে, ওর সঙ্গে গল্প করবে। এই তো আমেরিকায় গিয়েও রোজ ছেলের সঙ্গে ফোনে গল্প করে। কোনওদিনও বাদ যায় না।

বাইরে কলিংবেল বেজে উঠল। ঘর পরিষ্কারের মেয়েটা এসেছে নিশ্চয়ই। দরজা খুলতে যাবে, আবার ফোনে রিং। দরজা খোলে বিতান। কাজের মেয়ে মিনতি এসেছে। ফোনে রিং হয়েই চলেছে। ফোনটা দৌড়ে এসে ধরে বিতান।

উলটো দিকের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজিতে বলে ওঠে,—আপনি কি জয়ন্তর স্ত্রী?

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি জয়ন্তর অফিস থেকে বলছি। ওর আমেরিকার অফিসের কোলিগ আমি। আমার নাম মাইক।

—কি—কিছু অসুবিধে হয়েছে জয়ন্তর?

কণ্ঠস্বর খানিকক্ষণ থেমে থাকে। দ্বিধাজড়ানো গলায় বলে ওঠে,—দশমিনিট আগে আমরা খবর পেয়েছি জয়ন্ত যে ফ্লাইটে ডেট্রয়েট যাচ্ছিল সেটা ক্র্যাশ করেছে। ফ্লাইটে কেউ বেঁচে আছে কিনা আমরা সে খবর এখনও পাইনি।

খানিক থেমে মাইক ফের বলে,—দু:খ জানানোর কোনও ভাষাই নেই আমার কাছে। এত মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা এখান থেকে সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করছি—

মাইক থেমে যায়। অন্যপ্রান্তে যে বিতান আর নেই তা টের পেয়েছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে বিতান মাটিতে বসে পড়েছে। জয়ন্ত নেই! খানিক দূরে পিকু চেঁচিয়ে ওঠে,—মা, বাবাই-এর ফোন? কবে আসছে?

—ম্যাডাম, আমি অত্যন্ত দু:খিত। আমরা রজতের সম্বন্ধে এত কমপ্লেন পাচ্ছি যে ওকে আর এই স্কুলে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। হি ইজ নট নর্মাল। হি নিডস ট্রিটমেন্ট।

—আপনি তো জানেনই, ওর বাবা একবছর আগে মারা যায়। এয়ার ক্র্যাশে। তারপর থেকেই ও মাঝেমধ্যে এরকম বিহেভ করে। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। কথা দিচ্ছি—

—আচ্ছা, আপনিই বলুন আমরা অন্যান্য পেরেন্টসদের কী বলব। এই নিয়ে তিনবার হল। হঠাৎ করে ও প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন হাতের কাছে যা পায় তাই ছোঁড়ে। ও এখনও বিশ্বাস করে যে ওর বাবা জীবিত। কেউ সেটা মানতে না চাইলে, ও তার সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেয়।

—আমি ওকে বোঝাব। প্লিজ ম্যাম, আমাকে আর একবার চান্স দিন।

—আর অ্যাটেন্ড্যাস! অর্ধেকের বেশিদিন ও স্কুলে আসেনি। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দ্যাট?

—ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। আমি কথা দিচ্ছি ও আসবে—রেগুলার ক্লাস করবে এখন থেকে।

অসহায় দৃষ্টিতে বিতান প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী করে বোঝাবে যে স্কুল থেকেও যদি ওকে বার করে দেওয়া হয়, তাহলে কোনওভাবেই পিকুকে আর স্বাভাবিক করে তোলা যাবে না। সব ডাক্তারের একই পরামর্শ—পিকুকে যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখতে হবে। তবেই আস্তে আস্তে ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে। শেষে কোনওমতে প্রিন্সিপ্যাল রাজি হন। আর জানিয়ে দেন যে এবারই লাস্ট চান্স।

পিকু আজকাল আগের মতো গল্পের বই পড়ে না, খেলাধুলো করে না। কারুর সঙ্গে মেশে না। এমনকী বাবার পড়ার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে খেপে ওঠে। তখন ওকে ধরে রাখাই দায় হয়। হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে ফেলে। চিৎকার করে বলতে থাকে—তোমরা সবাই বিচ্ছিরি, মিথ্যেবাদী। কেউ খেলতে জানো না। গল্প বলতে জানো না।

বিতান জানে না ওর ছেলে আর কোনওদিন স্বাভাবিক হবে কিনা। যাকে একসময় সারাক্ষণ ঘরে ছোটাছুটি করতে দেখত, সবসময় হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল দেখত,—সেই এখন চুপচাপ অন্ধকার ঘরে বসে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে মনে হয় যে একদম অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছে।

এরমধ্যে দুদিন বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে গেছে। বিপদ হতে পারত। নেহাতই বিতান খুব সতর্ক ছিল, তাই দুবারই কয়েকমিনিটের মধ্যে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোকজন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি করে পেয়েছে। বাড়িতে এখন সবসময় তটস্থ হয়ে থাকে, কখন কী বিপদ হয়!

৪

—কাকু, আমার কোনও চিঠি আছে? আমেরিকার থেকে?

মনোহরবাবু সাইকেল থেকে নেমে ছেলেটার দিকে তাকালেন। সেই ছেলেটাই। রোজ একই প্রশ্ন করে। দোতলা বাড়ির একতলার গ্রিল দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

অন্যদিন কোনওরকমে 'না' বলে চলে যান। এমনিতেই আজকাল চিঠিপত্র আদানপ্রদান খুব কমে গেছে। দু-একটা আসে বিদেশ থেকে। তা সেটা আগে থেকেই খেয়াল থাকে। তা আজ শুধু 'না' বলে থেমে থাকলেন না মনোহরবাবু। ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। রোগা—বছর আটেক বয়েস হবে। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল—গভীর দৃষ্টি। রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেলেও ফরসার দিকে।

—কেন তোমার কি কারো চিঠি আসার কথা অছে?

চুপ করে থাকল ছেলেটা।

—কী নাম তোমার?

—পিকু। আমার জন্য কোন আমেরিকার চিঠি নেই না?

—না বাবু। কার চিঠি?

—না—এমনিই—বলে ছেলেটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মনোহরবাবুর অজ একটু সময় আছে। দোনামনা করে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কলিংবেলটা টিপলেন। দু-তিনবার টেপার পরে দরজা খুলল এক মাঝবয়েসি মহিলা। মাঝারি গড়ন-সুন্দরী। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় সারা পৃথিবীর সমস্ত দু:খ এসে দানা বেধেছে।

একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন মনোহরবাবু। আমি এখানকার নতুন পিওন। মাসদুয়েক এসেছি। বারান্দায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল—নাম বলল পিকু—ওকি আপনার ছেলে?

অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল মহিলার। মুহূর্তে সজাগ হয়ে বলে উঠল—কেন কিছু গন্ডগোল করেছে?

—না—তা নয়। আসলে মাঝেমধ্যেই জিগ্যেস করে ওর আমেরিকা থেকে কোনও চিঠি এসেছে কিনা! কিছু আর্জেন্ট চিঠি আসার কথা আছে?

বিতান একটু দ্বিধা করে বলে উঠল,—আসলে ওর বাবা একসময় আমেরিকায় ছিলেন। তাই।

—তা এখনও উনি ওখানেই?

—না কয়েকবছর হল—খানিকক্ষণ থেমে বিতান ফের বলে উঠল—ওখানে মারা গেছেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মনোহরবাবু। কি বলবেন জানেন না। মৃত্যু তো আসেই। কারোর সময়ে আসে কারোর অসময়ে। কিন্তু বাড়ির রং চটা দেওয়াল—আগাছা ভরা বাড়িতে ঢোকার রাস্তা—আর সর্বোপরি ওই মহিলার মুখ দেখে একটা কথাই মনে হল মনোহরবাবুর। কারো কারো মৃত্যু অনেকসময় এত গভীর দাগ ফেলে যায়, যে সে দাগ আর মোছে না। এখানে যেন তাই জীবনটা শামুকের গতিতে এগোচ্ছে।

মনোহরবাবু আর কথা বাড়ালেন না। বেরিয়ে এলেন। ছেলেটা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রিলের রডে নাক ঠেকিয়ে ওনারই দিকে তাকিয়ে আছে।

৫

—আচ্ছা মা, রাতুল বলছিল এয়ারক্র্যাশ হলেও অনেকে নাকি বেঁচে যায়। ও বলছিল যে যারা প্লেনে বেল্ট বেঁধে বসে থাকে, তাদের নাকি কিছু হয় না। সত্যি মা? ওরা প্লেনে করে ভুটানে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন এয়ার হোস্টেস ওকে বলেছে।

—হতেও পারে সোনা।

—তা হলে মা—বাবাই বলে থেমে যায় পিকু। বিতান কথা বলে না। শুধু পিকুর চুলে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। কিন্তু আজ তারা নেই। সবক'টা মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে। তবু এই মুখ গোমড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের জলটাকে সামলে নিল বিতান। আজ ওর মন একদম ভালো নেই। আর মন ভালো না থাকলেই ওরা বাড়ির ছাদে চলে আসে। চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশার ছোট্টজীবন ওই বিশাল আকাশের কাছে সমর্পণ করে খানিকক্ষণের জন্য শান্তি পাওয়া যায়।

নতুন বছর সবে শুরু হয়েছে। আজ ৩ জানুয়ারি। পরশুদিন সারা শহর যখন নতুন বছরকে বরণের নেশায় উন্মত্ত ছিল, তখন বিতানের একাকীত্ব যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা হাসির আওয়াজ-গান-জোরে কথাবার্তা—সবকিছুই যেন অসহ্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল সবাই যেন ওদেরকে নিয়েই ঠাট্টা করছে। সবাই যেন ওদেরকে আরও একঘরে করে দিয়েছে। পিকুর উদাস মুখ—

মাঝেমধ্যে উদ্দেশ্যহীন ছটফটানি যেন ওই অনুভূতিটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সত্যিই এ-বাড়িতে কিসের যেন বড় অভাব।

আজকে পিকুর স্কুলে অ্যানুয়াল স্পোর্টস ছিল। ওর এখন ক্লাস ফোর হয়েছে। রিলে রেসে সিলেক্টেডও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিকু স্কুলে গিয়ে যে কি ক্ষেপে গেল! কিছুতেই দৌড়বে না। অথচ ও না নামলে ওদের পুরো টিমই দৌড়তে পারবে না। কোনওভাবেই রাজি করানো গেল না পিকুকে। শেষে স্কুল থেকে ওকে শাস্তি দিয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ ক্লাসরুমে নিলডাউন করে খেখেছিল। বিতানকেও ক্লাস টিচার ডেকেছিলেন। মাথা হেঁট করে পিকুর সম্পর্কে হাজারো নালিশ শুনতে হয়েছে। ক্লাসে মনোযোগ নেই। কারও সঙ্গে কথা বলে না। কোনও বন্ধু নেই। এমনকী মিস ওর সম্বন্ধে 'অস্বাভাবিক' কথাটা বলতেও ছাড়েননি।

অথচ বিতান জানে যে এসবের পিছনেই আছে ওর বাবার হঠাৎ মৃত্যু। এই তীব্র অভাববোধ সময় সময় ওকে পাগল করে দেয়। আজকেও নিশ্চয়ই খেলার মাঠে প্রায় সবারই বাবাকে সঙ্গে দেখে ওর এই পাগলামি।

বিতান জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চায় বারবার। যে চলে গেছে সে তো আর কখনই আসবে না। কিন্তু পিকুর এই ব্যবহারই ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দেয় না। আরও বেশি করে জয়ন্তর কথা মনে করায়। তাই রাগটা পিকুর ওপরেই প্রকাশ করে বিতান। আজও মাথা এত গরম হয়ে গিয়েছিল যে বাড়িতে এসে বেশ কয়েক ঘা পিকুকে দিয়ে তবেই ঠান্ডা হয়েছে বিতান। তারপরে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তারপরে ছাদে উঠে এসেছে। এতসব ঘটনা যেদিন ঘটে যায় সেদিন কি আর খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় না নিয়ে ওরা পারে! মনে হয় ওই মেঘের আড়ালেই কোথাও যেন জয়ন্ত আছে। একটা অজানা উষ্ণতা শীতের সন্ধেতেও ছুঁয়ে যায় ওদের। বিতান ছেলের হাতটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেয়।

৬

বাড়ির গ্যারেজে বসে কম্পিউটার মেরামতি করছিল পিকু। ছুটির দিন মানেই বাড়ির বিকল হওয়া যন্ত্রগুলো নিয়ে দিন কাটানো। বেশ লাগে পিকুর। প্রত্যেকটার সঙ্গেই বহুবছরের পরিচয়। শৈশব কৈশোর—পুরোটাই কেটেছে এসব নিয়ে। এদের ছায়াতেই পেরিয়েছে নি:সঙ্গ দিনগুলো। এক নীরব জগতে এদের সঙ্গেই কথা বলে পিকু কাটিয়েছে এতগুলো বছর। তাই যখনই এদের কোনও একটা সামান্য খারাপ হয়—ডাক্তারি করতে বসে যায় ও।

অপারেশন যে সবসময় সফল হয় তা নয়। তবে অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় পিকু। তাই গ্যারেজটা হল ওই সব পেশেন্টের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।

আজকের পেশেন্ট বহুদিনের পুরোনো কম্পিউটার, স্টার্ট হয়েই আপনা থেকে শাট ডাউন হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আজ বাবার কথা খুব মনে হচ্ছে। এই কম্পিউটারেই বাবা কাজ করত। মাঝে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। অনেক স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে কাটানো প্রত্যেকটা মুহূর্তের রং আজও ফিকে হয়নি। আজও অনেক রাতে বাবার স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বসে পিকু। আর ঘুম আসে না। বাবার দেওয়া ছোট ছোট ধাঁধাগুলো চোখের সামনে ভাসে। 'বলতো সোনা, এই ঘরেই আছে—তিন হাত তিন দিকে, শুয়ে থাকে শীতে সুখে।'—ফ্যান।

তখন না পারলেই বাবার ওপর রাগ করত। তর্ক করত। কিন্তু কীভাবে জানি এসব কিছুই নেশা হয়ে উঠেছিল পিকুর কাছে। স্কুল ফেরত অন্য ছেলেরা যখন ভিডিয়ো গেমস খেলত—ও মজে থাকত ধাঁধায়। মনে হত ধাঁধার ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে বাবাই।

এই তো সেদিন একটা শক্ত পরীক্ষার আই কিউ টেস্টের অংশটা দেখে ও আনমনে পুরো দু-ঘণ্টার পরীক্ষাপত্র মাত্র কুড়ি মিনিটে শেষ করে ফেলল। কিন্তু পরীক্ষা দিতে ওর ভালো লাগে না। কেন যেন ওর মনে হয় যে পরীক্ষা মানেই একটা বাঁধন। চারদিক থেকে দাগকাটা একটা মাঠ—তার মধ্যে আরও কয়েকজনের সঙ্গে অহেতুক দৌড়। এই দৌড়ই ওর কোনওদিন ভালো লাগেনি। মনে হয় এই দৌড়ই হয়তো বাবাকে কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে। না হলে তো বেশ ছিল লুডোর বোর্ডের দুনিয়া। হার-জিত হয়, কিন্তু বারবার শুরু করা যায় শুরু থেকে।

এত বছর হয়ে গেছে, এখনও বাবার পড়ার ঘরে যেতে ওর খুব খারাপ লাগে। ওঘরে সার দিয়ে বইয়ের আলমারি, নানান ধরনের বই। বাবার ছুটির দিনের অনেকটা সময় জুড়ে থাকত বই। আর ছোট্ট পিকু উঁকিঝুঁকি মারত দরজার ফাঁক দিয়ে। ভারি রাগ হত বইগুলোর ওপর। বাবার সঙ্গে খেলার সময়টা কেড়ে নিচ্ছে ওরা।

বাবা পিকুকে বলত,—বুঝলি পিকু, এসব বই তোর জন্য। বড় হয়ে পড়বি। দেখবি এদের জগৎ একেবারে আলাদা। এ জগতে ঢুকতে গেলে শুধু মনের দরজাটা খুলে রাখতে হয়। এরা তখন তোর সঙ্গে কথা বলবে, আর বলে দেবে কীভাবে সত্যিকারের মানুষ হতে হয়।

—দাদাবাবু, ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এ লুডোটা পেলাম—ফেলে দেব? চাকর গণেশের কথায় হুঁশ ফিরল পিকুর।

গণেশ ঘর পরিষ্কার করে। ওকে আজকে বাবার পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করতে বলেছিল পিকু।

—কই দেখি!

—আলমারির পিছনে পড়ে গিয়েছিল। কী নোংরা যে হয়েছিল ঘরটা!

লুডোটা হাতে নিয়েই চোখে জল এল পিকুর। কুড়ি বছর আগে কত দিন কেটেছে এই লুডো নিয়ে।

—না, ফেলো না। বলে লুডোর পাতা ওলটাল পিকু। সাপলুডোর পাতাটা দেখে মনে হল কতবার দান ফেরত নিত। সাপ পড়লে চলবে না। সিঁড়ি মিস করলে চলবে না। বায়না করে ঠিক আদায় করে নিত। জীবনের সাপলুডোতেও যদি একইভাবে বায়না করে বাবার কয়েকটা দিন আরও আদায় করা যেত!

সাপলুডোর 4 আর 18—ওই নাম্বার দুটোতে ক্রশ। লাল পেনসিলের দাগ। লুডোটা হাত থেকে নামিয়েই রাখছিল পিকু, হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতেই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

বাবার আমেরিকা যাওয়ার কয়েকদিন আগের কথা। সেদিন বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে অফিসের পোশাকেই পিকুর সঙ্গে লুডো খেলছে। হঠাৎ একটা ফোন এল। বাবা উঠে অন্য ঘরে চলে গেল। খানিকবাদে ফিরে এল। সেদিন বাবা বারবার খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। বারবার পিকুর মাথায় হাত রেখে আদর করছিল। আর স্পষ্ট মনে আছে ওই দুটো বক্সে বাবা পিকুর পেনসিল দিয়ে ক্রস করে বলেছিল,—কী বলত এটা পিকু?

তারপর একটু থেমে ভারী গম্ভীর গলায় বলেছিল,—দুটো সাপ—যাদের আমি কখনও ডিঙোতে পারব না।

পিকু তখন সংখ্যা ভালো চিনত না, সাপ চিনত। তাই অদৃশ্য সাপের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। আর আজ খুব অবাক লাগছে যে ওই সংখ্যাদুটো পাশাপাশি বসালে যেটা হয় সেটা হল বাবার মৃত্যুদিন। 18 এপ্রিল। 2002 সালের ওই দিনেই বাবার এয়ার ক্র্যাশ হয়। এটা শুধুই কোইনসিডেন্স? হঠাৎ করে মিলে যাওয়া?

গ্যারেজ থেকে ওপরে উঠে এল পিকু। সারা বাড়িটাই খুব অগোছালো অবস্থায় আছে। দু-বছর আগে মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাড়িটা গণেশের ওপর থাকে।

ড্রয়িংরুম পেরিয়ে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকল পিকু। অনেকদিন এঘরে ঢোকেনি ও। বুককেসের ভেতরে সারি সারি বই। নীচের তাকে বাবার অনেক খাতাপত্র, ফাইল। সময়ের দাগ পড়েছে সেসব কাগজে। লাল হয়ে

উঠেছে। বাবা নিয়মিত ডায়েরি ফলো করত। পরপর সাজানো ডায়েরিগুলো। প্রত্যেক বছরের ডায়েরি খুলে ভালো করে দেখল পিকু। নাহ, কিছুই তেমন চোখে পড়ল না।

বাবা মারা যায় 18 এপ্রিল 2002। তার কয়েকদিন আগে ডায়েরির পাতায় ড: ডেভ জর্ডন বলে একজনের নাম লেখা। অ্যাড্রেসও আছে। অ্যানআর্বার শহরের ঠিকানা। একটা ফোন নাম্বারও লেখা। কী ভেবে পিকু ওই নাম্বারে ফোন করল। রং নাম্বার, খুবই স্বাভাবিক। কুড়ি বছরে মানুষই পালটে যায়, ফোন নাম্বার তো পালটাবেই।

কাগজপত্রের মধ্যে থেকে পিকুর ছোটবেলাকার একটা ছবি বেরোল। তিন-চার বছর বয়সের ছবি। কবে তোলা কিছু মনে নেই। ফোটোটা বার করে টেবিলের ওপর রাখল পিকু। তারপর কী মনে হতে আবার হাতে তুলে নিল। এটা কি ওরই ছবি! চোখের পাশে কাটা দাগটা কীসের? ওখানে তো কোনওদিন পিকু চোট পায়নি। আর ছবিটা সাদা-কালো কেন? ওর সব ছবিই তো কালার্ড। ছোটবেলারও। আর ছবিটা দেখে মনে হয় না ভারতে তোলা। পিছনে সার দিয়ে লাল পাম গাছ।

খানিক ভেবে অরিন্দমকাকুর নাম্বারটা বের করে ফোন করে পিকু। অরিন্দমকাকু বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ওনার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

৭

—কী খবর? এতদিন বাদে পিকু সাহেবের ফোন?

—কাকু একটা জরুরি দরকারে তোমাকে ফোন করছি।

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার বল।

—শোনো, আমি সেদিন একটা পুরোনো লুডো খুঁজে পেয়েছি। এটা আমি আর বাবাই একসঙ্গে বসে খেলতাম। বহু বছর আগে। বাবাই আমেরিকা যাওয়ার দুদিন আগেও খেলেছি। তা, ওই লুডোর বোর্ডে দুটো সংখ্যা মার্ক করা ছিল, আর সেটা হল বাবার মৃত্যুদিন।

—আশ্চর্য! তা তোর কী মনে হয়? পরে কেউ ওই বোর্ডে মার্ক করতে পারে?

—না, তার সম্ভাবনা খুব কম। বাবাই-এর মারা যাওয়ার খবরটা পেয়ে আমি রেগে ওই লুডোটা বইয়ের আলমারির পেছনে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর ভুলেও গিয়েছিলাম। এতদিন বাদে ঠিক ওই জায়গাতেই লুডোটা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কারও ওই লুডোতে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না।

—তাহলে কী হতে পারে? কোনওভাবে মিলে গেছে।

—আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। বাবাই আর আমি খেলছিলাম—একটা ফোন এল। বোধহয় বাইরের ফোন। আমার মনে হয়, তখনই বাবাই ওটা লেখে।

—তাহলে কী হতে পারে? এটা তো কোনওভাবেই এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না। তবে তুই বললি বলে মনে পড়ল। তোর বাবা তো প্রায়ই বাইরে যেত। তা সেবারে যাওয়ার আগে কেন জানি আমার কাছে এল। সন্ধেবেলা—আমি সবে অফিস থেকে ফিরেছি। কথায় কথায় বলল, তোর আর তোর মা'র ওপর যেন খেয়াল রাখি। আর কোথায় কোথায় ওর ফিক্সড ডিপোজিট, ইনসিওরেন্স আছে, তার ডিটেলসের একটা প্রিন্ট আউটও নিয়ে এসেছিল। তাহলে কি ও টের পেয়েছিল যে ওর মৃত্যু হতে পারে—কে জানে?

—এটাও তো হতে পারে যে ওটা কোনও প্ল্যানড মার্ডার। বাবাইকে কোনও ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল। বাবাই কোনওভাবে জানতেন ঘটনাটা ওই দিনেই হবে। আচ্ছা কাকু, বাবাই-এর অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়?

—ঠিক বলেছিস। তুই বড় হয়েছিস, তাই তোকে বলি। তোর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু আমরা তো স্কুলের বন্ধু। ওর কোনও অফিসের বন্ধু সেরকম ছিল না। শুধু তাই নয়, ও অফিসের ব্যাপারে কোনও কথাই প্রায় বলত না। শুধু জানতাম যে ও 'ইনোভেটিভ সলুশনস'-এ কাজ করে।

—আচ্ছা কাকু, আমার কি কোনও দাদা ছিল, ঠিক আমারই মতো দেখতে?

—কী আবোল তাবোল বলছিস! দাদা থাকলে তুই জানবি না? আমি জানব না? কেন, হঠাৎ করে মনে হল কেন?

—আমার কেন জানি না, ছোটবেলা থেকেই মনে হত যে আমার সঙ্গে কারও অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে। কমপ্যারিসন। বিশেষ করে মা'র কথায়। হয়তো খাচ্ছি—মা হঠাৎ বাবাইকে বলে উঠত—দ্যাখো ঠিক ওর মতো খাবার ধরন। মুখে খাবার টোপলা করে রেখে দেয়। অথবা হয়তো বাবার সঙ্গে খেলছি, বাবা বলে উঠত—এ-ও দেখবে, খুব ইনটেলিজেন্ট হবে। কীরকম চটপট ধাঁধাগুলোর উত্তর দিচ্ছে দেখছ। একমাত্র ও ছাড়া আর কাউকে এরকম চটপট উত্তর দিতে দেখিনি।

—তা তোর হঠাৎ করে একথা খেয়াল হল কেন?

—কাল আমি একটা ছবি পেয়েছি। বাবার লেখার আলমারি থেকে। চট করে দেখলে মনে হবে আমার ছবি। কিন্তু পরে খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছে ওটা আমার নয়। একই বয়সের আমার ছবির খুব কাছাকাছি—কিন্তু আমি নই।

—ভারতে ফেরার আগে তোর বাবা প্রায় বারো বছর আমেরিকাতে ছিল। তখন আমার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবে...

—কী, কাকু? তবে কী? মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কাল ওই ছবিটা পাওয়ার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করি। একটা পুরোনো অ্যালবামে আরও কিছু ছবি পাই। ওই ছেলেটারই। ছবিগুলো বিদেশের। দেখেই বোঝা যায়। আমি তো কখনও বিদেশেই যাইনি। তুমি লুকিও না কাকু, আমার জানা দরকার, হয়তো বাবার মৃত্যু আর এটা রিলেটেড।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে অরিন্দম বলে,—জেনেই যখন গেছিস—তখন বলছি। তোর বাবা আর মাকে কথা দিয়েছিলাম যে এ ব্যাপারে আমি তোকে কোনওদিন কিছু জানাব না। হ্যাঁ, তোর এক দাদা ছিল। বছর পাঁচেক বয়সে মারা যায়। এটা আমেরিকাতে থাকাকালীন হয়। আমি কখনও তাকে দেখিওনি।

—আমি তাহলে একইরকম দেখতে হলাম কী করে?

—সেটা জানি না। আমি তাকে দেখিওনি। এ রহস্যটা উদ্ধার করতে হবে।

৮

—স্যার, একটা ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কেন?

—ওর বাবা জয়ন্ত চ্যাটার্জি নাকি আমাদের কোম্পানিতে কাজ করত—কুড়ি বছর আগে। কিন্তু আমরা কোম্পানি রেকর্ডে কোথাও পাইনি।

—রেকর্ড ভালো করে দেখেছ?

—হ্যাঁ। ছেলেটা বেশ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করছে। ওর বাবা কুড়ি বছর আগে মারা যান। আমাদের কোম্পানির কাজে আমেরিকায় গিয়ে। মারা যান 2002-এ। এয়ার ক্র্যাশে।

—2002-তে তো আমিও ছিলাম। ওরকম কোনও ইনসিডেন্ট তো মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁ, স্যার আমিও আমাদের সব রেকর্ড দেখেছি। এরকম কোনও এমপ্লয়ির মারা যাওয়ার কথা কোথাও নেই।

—তা ছেলেটা কুড়ি বছর বাদে এসেছে কেন? দাবিদাওয়া নিয়ে?

—না, না, ছেলেটার কোনও দাবিদাওয়া নেই। এমনকী বলেছে যে আমাদের কোম্পানির থেকে ভালোরকম কমপেনসেশনও নাকি পেয়েছে। তা না হলে ওদের সংসারই চলত না।

—ইন্টারেস্টিং! পাঠাও তো ছেলেটাকে। দেখি কথা বলে। তুমিও থাকো। বললেন, মি. বকসি। উনি ইনোভেটিভ সলিউশনসের ইস্টার্ন রিজিয়নের হেড। ইনোভেটিভ সলিউশনস এখন সারা পৃথিবীর প্রথম দশটা আইটি কোম্পানির মধ্যে পড়ে। তবে কুড়ি বছর আগে সেরকম ছিল না। তখন মোটে হাজার দুয়েক কর্মী ছিল। একজন আরেকজনকে ভালোরকম চিনত।

মি: বকসির চেম্বারে ওনার সেক্রেটারি সীমার সঙ্গে একজন ছেলে এসে ঢুকল।

বসার সিট দেখিয়ে মি: বকসি ছেলেটার দিকে তাকালেন। চেহারার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ। চোখদুটো খুব উজ্জ্বল। চশমাতেও সেই ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়েনি। একটু যেন অস্থিরতার ভাব। হাতে একটা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইলটা রেখে একটা চিঠি বার করে মি: বকসির দিকে এগিয়ে দিল।

—অতবছর আগের সব চিঠিপত্র নেই, তবে পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে একটা চিঠি পেলাম।

—দেখি—! মি: বকসি অভিজ্ঞ চোখে চিঠিটাতে চোখ বোলালেন। ইনোভেটিভ সলিউশনসের লেটার হেডে। জয়ন্তর মৃত্যুতে দু:খ প্রকাশ করে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চিঠি দিয়েছেন। জানিয়েছেন দশ লাখ টাকা অর্থ সাহায্যের কথা। কিন্তু যার নাম সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লিখিত, সেই এন নরসিমহন—নাহ, মি: বকসি নামটা খেয়াল করতে পারলেন না।

—এই চিঠিটা রাখতে পারি? আমাদের একটু সময় দিতে হবে। দু-তিন দিনের মধ্যে চিঠিটা আসল না নকল তা বলে দিতে পারব।

—বুঝলাম না, আপনার কি মনে হয় চিঠিটা আসল নয়?

—এমনিতে সন্দেহ করার কিছু নেই। তবে সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে যাঁর নাম আছে, সেই এন নরসিমহন বলে কেউ ছিলেন না। তবু আমরা আমাদের সব রেকর্ড দেখব। তা, তোমার বাবার ছবি, পাসপোর্ট এসব কিছু আছে?

—হ্যাঁ, বলে এগিয়ে দিল পিকু, তবে বাবা তো সঙ্গে করে পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খুঁজে পাসপোর্ট-এর প্রথম দুটো পাতার কপি পেয়েছি। আপনি এটাও রাখতে পারেন। আমার কাছে কপি আছে।

—গুড! মি: বকসি একটু থামলেন। তিরিশবছরের চাকরিতে অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও হয়নি। ডিটেকটিভের ভূমিকায় নিজেকে ভেবে নিয়ে বললেন,—তা তোমার বাবার কোনও বন্ধু ছিল না? এ অফিসের কারও নাম জানতে?

—না, আসলে আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। মা-ও মারা গেছেন দু-বছর হল। বাবার এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে কথা বললাম, উনিও কিছু বলতে পারলেন না।

—আশ্চর্য! ঠিক আছে চিন্তা কোরো না। আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব যে উনি আমাদের অফিসে কাজ করতেন কিনা।

ধন্যবাদ জানিয়ে পিকু মি: বকসির চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

পিকু বেরোনোর পর মি: বকসি সেক্রেটারিকে একবার ডেকে নিলেন।

—সীমা, ছেলেটাকে সবরকমভাবে সাপোর্ট করো, আমি নিশ্চিত যে চিঠিটা জাল। কিন্তু প্রশ্নটা হল হুবহু কোম্পানির লেটারহেডে কে চিঠি লিখল, আর কেই বা কমপেনসেশন পাঠাল? আর এন নরসিমহন-ই বা কে? এমপ্লয়ি ডেটাবেসের সঙ্গে ছেলেটির বাবার ছবিটাও মিলিয়ে নিও।

৯

জীবনটা কোনওদিনই খুব সহজভাবে ধরা দেয়নি পিকুর কাছে। খুব হিংসে হত যখন স্কুলে দেখত অন্য ছেলেরা বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। মনে হত ম্যাজিকের মতো যদি ওর বাবাও এসে হাজির হত! এত বছরে ব্যাপারটা অবশ্য খানিকটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে জীবন যেন ওকে নিয়ে ফের ঠাট্টা করতে শুরু করেছে। একের পর এক অচেনা তথ্য সামনে এসে জড়ো হয়েছে।

ইনোভেটিভ সলিউশনস থেকে মি: বকসি ফোন করেছিলেন দুদিন বাদে। জয়ন্ত চ্যাটার্জি বলে কোনও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কোনওকালে ওই কোম্পানিতে কাজ করেনি। চিঠিটাও ভুয়ো। তাহলে প্রশ্ন, তখন অত টাকা পাঠাল কে? ওই টাকা না পেলে ওদের সংসারও চলত না। অনেকদিন আগের কথা। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েও কিছু জানা যায়নি।

এসব নিয়ে পিকু ভাবছে, হঠাৎ কলিংবেল বাজল। ক্যামেরায় পিকু দেখতে পেল বাইরে অরিন্দমকাকু। সঙ্গে সঙ্গে রিমোটে দরজা খুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পিকু। ঢোলা প্যান্ট, আগেকার দিনের চশমা আর ছাতা, অরিন্দমকাকুকে দেখলেই মনে হয় সময় যেন আর এগোয়নি। সেই কুড়ি বছর পিছিয়ে আছে। সবসময় মুখে হাসি।

পিকুর পিঠে চাপড় মেরে সোফার দিকে এগিয়ে গেলেন অরিন্দমকাকু।

বুঝলি পিকু, আরেকটা ইন্টারেস্টিং খবর চোখে পড়ল। বলে একটা পুরোনো খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন।—নিউইয়র্ক টাইমস। 1998, 17 জুলাই। লাইব্রেরির আর্কাইভ ঘাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল। ছবিটা দ্যাখ।

—একী! এ তো বাবার ছবি!

—হ্যাঁ, জয়ন্তর ছবি। শুধু তাই নয়, যাদের সঙ্গে ছবি তোলা তারা প্রত্যেকেই বিখ্যাত জেনেটিক সায়েন্টিস্ট। ছবিটা অ্যান আর্বারে, ইউনির্ভাসিটি অফ মিসিগানে তোলা। সঙ্গের লেখাটা পড়। জেনোম রিসার্চে যে টিম কাজ করছিল তার ছবি নাকি এটা।

—আশ্চর্য, বাবার তো অন্য প্রফেশন—উনি জিন-এর রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত হলেন কী করে?

—আমিও তাই ভাবছি। জয়ন্ত খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। তখনকার দিনে আমাদের বোর্ডের টপার। প্রচণ্ড হাই আই কিউ ছিল। তা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর ও যখন মাস্টার্স করতে বিদেশে গেল, তখন ওর সাবজেক্ট কী ছিল তা আমার জানা নেই। তারপর তো ও ওখানে ডক্টরেটও করেছিল। ও এসব নিয়ে কখনও আলোচনা করত না।

একটু থেমে অরিন্দমকাকু আবার বললেন,—আমি বলি কি পিকু, এখানে বসে না থেকে আমেরিকায় চলে যা। যা কিছু ঘটেছে, সবই তো ওখানে।

—কিন্তু আমেরিকা তো একটা বিশাল দেশ। যাব কোথায়?

—কেন? তুই ইউনিভার্সিটি অফ মিসিগান দিয়েই শুরু কর। অর্থাৎ ডেট্রয়েট—অ্যান আর্বার। ওখানে নিশ্চয়ই কোনও সূত্র পাবি। আর আমার এক বন্ধু সুবীর রায় ওখানেই থাকেন। তুই ওখানেই গিয়ে উঠতে পারিস। তবে—

—তবে কী কাকু?

—নাহ, সে তেমন কিছু নয়। তবে সুবীরের ছেলে পিলে হয়নি। স্ত্রী-ও মারা গেছেন। একটু বেশি কথা বলে। আর—

—আর, আর কী?

—বাঙালির যা অভ্যেস, একটু বাড়িয়ে বলে। হেসে উঠলেন অরিন্দমকাকু।

কলকাতা থেকে দুবাই। দুবাই থেকে ডেট্রয়েট। আজকালকার দিনে প্রায় সবাই ছোটবেলা থেকেই প্লেনে চড়ে। পিকুর অবশ্য এবারই প্রথম। আর প্রথমবারেই এতটা পথ। তাই সময় যেন কাটতেই চাইছিল না।

ডেট্রয়েট যখন পৌঁছোল তখন ওখানে সন্ধে। ইমিগ্রেশনের বিশাল লাইন। তবে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করায় বেশ তাড়াতাড়ি লাইন থেকে বেরিয়ে গেল।

লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে ফোন করল সুবীর রায়কে। এয়ারপোর্টের কাছেই গাড়ি পার্ক করে উনি পিকুর ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। মিনিট দশেক বাদে পিকু দেখল অদ্ভুত সবুজ রঙের একটা বিশাল গাড়ি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি থামতে এগিয়ে গেল পিকু। ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

—পিকু?

—হ্যাঁ।

—আরে আমি অনেকক্ষণ এসে গেছি। ভাবলাম ফ্লাইট যদি আগে পৌঁছে যায়। নাও, গাড়িতে ওঠো, আমার বাড়িটা অ্যান আর্বারের নর্থ-ওয়েস্ট সাবার্বে। পয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।

—তা আপনি তো এখানে বহুদিন আছেন, আমার বাবাকে চিনতেন না? জয়ন্ত চ্যাটার্জি।

—না, আসলে আমার তো এখানে ব্যবসা। আগে সানফ্রান্সিসকোতে ছিলাম।

একটু থেমে সুবীরবাবু বলে উঠলেন,—তোমার বাবা তো এয়ার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ, আমেরিকান এয়ারলাইনস। 2002-এর 18 এপ্রিল।

—আমার মনে আছে ইনসিডেন্টটা। প্লেনটা ভেঙে পড়ে ডেট্রয়েট থেকে দুশো মাইল দূরে। চুপ করে গেলেন সুবীর রায়।

পাশে পিকু জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। পিকুর উদাসীন হওয়ার কারণটা বুঝতে পেরে ফের বলে উঠলেন,—বুঝলে, আমার দারুণ লাগছে। এতদিন বাদে বাড়িতে একজন বাঙালি অতিথি। এক সময় তবু বন্ধু-বান্ধবদের যাতায়াত ছিল। এখন সবাই ভিডিয়ো ফোনে খোঁজ নেয়। কেউ আর আরেকজনের বাড়ি যায় না। আমার বাড়িটা বিশাল। লাগোয়া বাগানটাও বেশ বড়। ওখানে শয়ে শয়ে হরিণ আসে। লুকোচুরি খেলে।

বলেই পিকুর অবাক চোখের দিকে তাকালেন, শ'খানেক না হলেও দু-তিনটে রেগুলার আসে। তা যা বলছিলাম, তুমি কি এখানে কোনও কাজে এসেছ?

—হ্যাঁ, আমি আমার রিসার্চ সংক্রান্ত কিছু কাজ নিয়ে এসেছি। তাছাড়া বাবা তো এখানেই মারা গিয়েছিলেন, তাই জায়গাটা দেখার ইচ্ছে আছে। বাবার শেষ দিকের রিসার্চ নিয়েও একটু খোঁজ খবর নেব।

অরিন্দমকাকু পিকুকে আগেই বলে রেখেছিলেন আসার আসল কারণটা সুবীর রায়কে আসামাত্রই না বলতে। সাদাসিধে লোক—অহেতুক সবাইকে বলে বেড়াবেন। আপাতত গাড়ি ইন্টারস্টেট রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পাশে একটা গাড়িকে পুলিশ ধরেছে। রোবট পুলিশ। সাইডে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

ওদিকে তাকিয়ে সুবীরবাবু বলে উঠলেন,—এদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই। একটু নিয়ম ভাঙলেই ফলো করে এসে ঠিক ধরবে। আজকাল আমেরিকায় এ ধরনের রুটিন কাজে মানুষের বদলে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে।

—বলে একবার আড়চোখে তাকালেন পিকুর দিকে। ফের বলতে শুরু করলেন,—তা বলে এদের হাবাগোবা ভেবো না। ওরকম পিটপিটে চোখ, বোকা বোকা চেহারা হলে কি হবে! আইনজ্ঞান টনটনে। কয়েকদিন আগে একটা স্টেট হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল আমার পুরোনো এক বন্ধু কল্যাণ যেন

উলটোদিকে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। ওর সঙ্গে আমার বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাই টুক করে গাড়ি ঘোরালাম। যেখানে ঘোরালাম, সেখানে ঘোরানোটা নিষিদ্ধ। কিন্তু কলকাতার অভ্যেস যাবে কোথায়! যেই ঘুরিয়েছি দেখি সাইরেন বাজিয়ে এক পুলিশের গাড়ি হাজির। একটা বড় রকমের ফাইন। তা সে না হয় দিলাম! মনে হল রোবট পুলিশটার সঙ্গে একটু আড্ডা মারি। বন্ধু হারিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে যদি মেটানো যায়। বুঝিয়ে বলি কী জন্য ঘোরালাম। বন্ধুদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটু বোঝাই। আজকের দিনে স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ করে রাস্তায় দেখা পাওয়া কতটা ভাগ্যের ব্যাপার। ভালোরকম বোঝালাম। দেখি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। বারদুয়েক 'থ্যাংক-ইউ' ও বলল। তারপর দেখি আবার ফাইন করেছে। এবারের কারণ ওর অহেতুক সময় নষ্ট করা। বোঝো!

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। সুবীর রায়ের বাড়িটা বেশ ফাঁকা জায়গায়। শহরের একটা প্রান্ত। দেখেই বোঝা যায় বেশ উচ্চবিত্তদের পাড়া। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাড়িটা। গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে সিকিওরিটি কোড দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা।

১১

এখানে একটা বড় সুবিধে হল সব ইনফরমেশনই চট করে খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যান আর্বারের লাইব্রেরিতে 2002-এর 19 এপ্রিলের খবরের কাগজটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। ডিজিটাল কপি আর্কাইভ করা ছিল। সেটাতে চোখ বোলাল পিকু।

নিউইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট যাচ্ছিল আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট E120। তিরিশ জন যাত্রী ছিল তাতে। বেশিরভাগই বিজ্ঞানী। জেনেটিক সায়েন্সের ওপর এক কনফারেন্সের পর ডেট্রয়েটে ফিরছিলেন তাঁরা। পথে প্লেন দুর্ঘটনা হয়—সকাল সাড়ে ছ'টার সময়। ডেডবডিগুলো সনাক্ত করা যায়নি। নামের লিস্ট আছে—চোখ বোলাতেই তাতে ঝাপসা চোখের সামনে জয়ন্ত চ্যাটার্জির নামটা দেখতে পেল পিকু। খবরটা তাহলে মিথ্যে নয়। অন্যান্য যাত্রীর নামের মধ্যে আরেকটা পরিচিত নাম পেল পিকু। ডেভ জর্ডন। এরই নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, বাবার ডায়েরিতে পেয়েছিল পিকু।

আচ্ছা, এই নাম-অ্যাড্রেস তো পিকুর কাছেই আছে। বাড়িটা যখন অ্যান আর্বারে, যাওয়াটা শক্ত কিছু নয়। একবার গিয়ে খোঁজ নেবে কি?

হয়তো ডেভ জর্ডনের পরিবারের কেউ এখনও ওখানে থাকেন। হয়তো বাবার সম্বন্ধেও কিছু বলতে পারবে।

পরের দিন কাগজটা খুলল পিকু। 20 এপ্রিল 2002। ক্র্যাশের খবরটা নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতা জুড়ে। ক্র্যাশসাইটের কয়েকটা টুকরো ছবি। প্লেনের ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো। একটা আধপোড়া জুতো। এ ধরনের প্লেনে আগে কখনও এরকম বিপর্যয় ঘটেনি। প্রাথমিকভাবে যেভাবে হঠাৎ করে ভেঙে পড়েছে তা দেখে অনুমান করা হচ্ছে বিমানে কোনও বিস্ফোরণ হয়েছিল। ডেটা রেকর্ডার—ভয়েস রেকর্ডার খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। টেররিস্টদের হাত থাকলেও থাকতে পারে।

22 এপ্রিলের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় বড় করে বিমান দুর্ঘটনার প্রতিবেদন। তাতে প্লেনের সব যাত্রীদের ছবিও আছে। বাবারও ছবি আছে দ্বিতীয় সারিতে। চুপ করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল পিকু। কত আপনজন একমুহূর্তে কত দূরে চলে যায়। বাবার মুখে সেই ছেলেমানুষি হাসি। তাহলে খবরটায় কোনও ভুল নেই। অন্তত প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে বাবার মৃত্যু নিয়ে কোনও রহস্য নেই। তবু—তবু কেন পিকুর আজও মনে হয় সব তথ্য ভুল। আজও মনে হয় মানুষটা সামনেই জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

আরেকটা কথা খেয়াল হল, বাবার পাসপোর্ট নাম্বার আর আমেরিকার স্যোশাল সিকিওরিটি নাম্বার তো পিকুর কাছেই আছে। তার থেকেও যদি কিছু সূত্র পাওয়া যায়। গত কয়েকবছর আমেরিকাতে প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশনের জন্য কার্ড চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আগের স্যোশাল সিকিওরিটি নাম্বার দিয়েও যে কারও সব তথ্য খুঁজে বের করা যায়।

পিকু ইন্টারনেটে সার্চ করল ওই নাম্বার ধরে। ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে এরকম একটা বিশেষ সংস্থা ওই নাম্বারের ওপর নির্ভর করে কোনও ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সামান্য চার্জের বিনিময়ে জানিয়ে দেয়। তাতে সার্চ করতে জয়ন্ত চ্যাটার্জির আমেরিকায় থাকার যাবতীয় ইতিহাস চট করে পেয়ে গেল পিকু। 86 থেকে 93 বস্টন। দুটো ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস। তারপর 93 থেকে 97 ডেনভার কলোরাডোতে। 97-এর শেষের দিকে কলকাতায়।

কিন্তু এসব অ্যাড্রেসের বাইরেও আরেকটা অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে জয়ন্ত চ্যাটার্জির নামের সঙ্গে। 91 থেকে 2002। আর সেটা অ্যান আর্বারের অ্যাড্রেস, অর্থাৎ যেখানে পিকু এখন আছে।

অ্যান আর্বারে বাবার থাকার কী কারণ? আর তা কেউ জানত না কেন? দ্রুত ওই অ্যাড্রেসটা নোট করে নিল পিকু।

আর মিনিট পাঁচেক বাদে পিকু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল। সুবীরবাবু বাইরে অপেক্ষা করছেন।

—কী কাকু, আপনি ভেতরে এলেন না কেন?

—এসেছিলাম বাবা। একজনের সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম। লোকটাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। জিগ্যেস করছিলাম কোথায় থাকে, কী করে ইত্যাদি। তারপর সুপারবোল খেলা, আজকের ওয়েদার এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি, হঠাৎ দেখি লাইব্রেরির সিকিউরিটি এগিয়ে আসছে। কথা বলা বারণ। তাই আমাকে নাকি বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে হবে। বোঝো! লোকটাকেও আসতে বললাম বাইরে। তা তার নাকি ভেতরেই একটু কাজ আছে। এলো না। অগত্যা একা দাঁড়িয়ে। যত সব নিয়ম! তা এবার কোথায় যাবে?

—এই অ্যাড্রেসটায় যেতে পারলে ভালো হত। তা এখন আপনার সময় হবে কি?

—কীসের অ্যাড্রেস?

—বাবা কোনও একটা সময়ে ওই ঠিকানায় ছিলেন। ইন্টারনেটে পেলাম। অ্যান আর্বারেই। তাই ভাবলাম যদি যাওয়া যায়।

—আরে অবশ্যই, এখনই চলো।

সুবীর বাবুর ফোর্ড গাড়িতে উঠে বসল পিকু। উনি ধারাভাষ্য শুরু করলেন,—বুঝলে পিকু, অ্যান আর্বার কিন্তু খুব পুরোনো শহর। মিসিগান ইউনিভার্সিটির বয়সই তো কয়েক হাজার বছর।

বলে পাশে বসা পিকুর মুখের হাসিটা দেখে বলে উঠলেন,—আহা, দুশো বছর কি কম হল! 1817 সালে মিসিগান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং, সারা বিশ্বের সেরা।...

জিপিএস অনুযায়ী গাড়ি ছুটে চলল অ্যান আর্বারের রাস্তা ধরে। ইউনিভার্সিটি, মিসিগান হসপিটাল পেছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলল দক্ষিণ শহরতলীর দিকে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে একটা মাটির রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। প্রাইভেটলি মেনটেনড রাস্তা। ধারে সাইনবোর্ডে লেখা দেখে বোঝা গেল যে হরিণ যে-কোনও সময়ে রাস্তা পেরোতে পারে। বাঁদিক-ডানদিকে বেশ খোলা খোলা মাঠ, ভুট্টাখেত। একটা বড় খামারবাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন সুবীরবাবু।



—এসে গেছি। দুম করে ঢুকো না। ট্রেসপাসিং হবে। বাড়ির লোক সেরকম সহৃদয় না হলে গুলিও চালাতে পারে।

অগত্যা দূরে থেকেই অপেক্ষা। তিনতলা বিশাল বাড়ি পাম গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাঝে সুরকি ফেলা পথ। গেটের ওপরে বড় করে লেখা 'স্ট্রাইবারস।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। এক বিশাল চেহারার মাঝবয়সি কালো মহিলা গেটের দিকে আসছেন। নিশ্চয়ই গেটে বসানো সিকিওরিটি ক্যামেরায় দেখেছেন। বেশ কড়া গলায় বলে উঠলেন, কী দরকার? কাকে চাই?

সুবীরবাবু থতমত খেয়ে বলতে শুরু করলেন।

পিকুর বাবার এয়ারক্র্যাশে মৃত্যু থেকে শুরু করে পিকুর আমেরিকায় আসা আর বাবার নাম দিয়ে সার্চ করে এখানকার অ্যাড্রেস খুঁজে পাওয়া—পুরোটাই সুবীরবাবু বললেন। যখন ওনার বলা শেষ হল, তখন ওই মহিলার চোখে জল।

মিসেস স্ট্রাইবার পিকু ও সুবীরবাবুকে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। স্ট্রাইবারদের এক ছেলে। সে বাইরে একটা কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওনারা এ-বাড়িতে আসেন 2004-এ। ব্যাঙ্কের থেকে কেনেন। এর আগের মালিক জয়ন্ত চ্যাটার্জি ব্যাঙ্কের লোন শোধ করতে না পারায় প্রপার্টিটা ব্যাঙ্কের হাতে চলে যায়। তাই খানিকটা কম দামেই বাড়িটা স্ট্রাইবারদের কাছে চলে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই বিশাল ড্রয়িংরুম। ডান দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি উঠে গেছে। তার পাশে একটা চওড়া প্যাসেজ এগিয়ে গেছে কিচেনের পাশ দিয়ে।

পিকুর দৃষ্টি লক্ষ করে মিসেস স্ট্রাইবার বলে উঠলেন,—এ বাড়ির আর্কিটেকচারটা খুব অদ্ভুত ছিল। বেসমেন্টের পুরোটা জুড়ে কোনও একটা ল্যাব ছিল। আমি যখন কিনি তখন কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না, কিন্তু দেখেই বোঝা যায়। দশ একরের ওপর এত বড় বাড়ি। কিন্তু ঘর মোটে পাঁচটা। সবক'টা ঘরই বড় বড় ছিল। আমরা ডিজাইনে বেশ কিছু চেঞ্জ করি। তা তোমার বাবা কি সায়েন্টিস্ট ছিলেন? রিসার্চ করতেন নাকি ল্যাবে?

এর উত্তর পিকুর অজানা। তবু মাথা নেড়ে সায় দিল পিকু। হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়ল পিকুর।

বাইরে কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোনও সময়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। অনেক রহস্য যেন লুকিয়ে আছে ওই মেঘের ঘন কালো অবয়বে। মিসেস স্ট্রাইবার জয়ন্তর সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না। এই বাড়িতে কখনই জয়ন্তর নামে কোনও চিঠিও আসেনি। কেউ খোঁজ নিতেও আসেনি। স্ট্রাইবাররা অবশ্য ব্যাঙ্ক থেকে শুনেছিল যে জয়ন্ত প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আরও কিছু কথাবার্তার পর ওরা উঠতে যাবে হঠাৎ ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন,—আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। বাড়ি কেনার পর একটা ছবির অ্যালবাম ওপরের ঘরে পেয়েছিলাম। ওটা তোমাদেরই হবে। দাঁড়াও এনে দিই।

বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বেশ খানিক বাদে একটা অ্যালবাম হাতে নিয়ে নীচে নামলেন।

ছোট অ্যালবাম, হাতে নিল পিকু। বাবার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে বস্টন-কলোরাডো-এখানকার কিছু ছবি। এই ড্রয়িংরুমেরও ছবি আছে। মা'র সঙ্গে ছবি। সঙ্গে ওর দাদাও আছে।

—আরে, এই তো তোমারও ছবি আছে। তুমিও এখানে ছিলে ছোটবেলায়!

পিকু আর বলল না যে ওটা পিকুর নয়। ঠিক ওরই মতো দেখতে ওর দাদার ছবি। এরই ছবি বাড়ির আলমারিতেও পিকু পেয়েছিল। প্রশ্নটা হল, এর কথা মা ও বাবা কেন কোনওদিন বলেনি। আর কেনই-বা এর সঙ্গে পিকুর এতটা মিল!

গাড়িতে উঠেই সুবীরবাবু প্রশ্নটা করে উঠলেন,—ওটা কি তোমার ছবি? তুমি তো এখানে আগে আসোনি? তোমার কি দাদা আছে নাকি?

—ছিল, মারা গেছেন—সংক্ষেপে জানাল পিকু।

সুবীরবাবু পিকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—ওহ স্যরি। কীভাবে?

পিকু চুপ করে রইল। সুবীরবাবু আর প্রশ্ন না করে গাড়ির চাবি ঘোরালেন। বলতে শুরু করলেন—আমার দাদা বছর পনেরো হল মারা গেছেন। আমি তখন এখানে।...

১২

দূর থেকে মনে হয় পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার রাস্তাতেও আবর্জনা পড়ে আছে। এদিক-ওদিক থেকে কাঁটা ঝোপগুলো মাথা-চাড়া দিয়েছে।

গ্যারেজে অনাথের মতো দাঁড়িয়ে আছে এক পুরোনো গাড়ি। নিসানের বহু পুরোনো মডেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বেল টিপল পিকু।

—তুমি শিওর এটাই ডেভ জর্ডনের বাড়ি? সুবীরবাবু বলে উঠলেন।

—হ্যাঁ, এ অ্যাড্রেসটাই ডায়েরিতে ছিল। বাবার ডায়েরিতে।

—নাহ, এখন আর কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। ফেরা যাক।

—আরেকটু দেখি।

আরও মিনিট দুয়েক কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফিরতে যাবে, ঠিক সেসময় বাড়ির দরজা খুলল। মাঝবয়সি এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। দেখেই বোঝা যায় একসময় খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। চেহারাতে শিক্ষা আর সম্ভ্রান্তির ছাপ।

—আচ্ছা এখানে কি ডেভ জর্ডন থাকতেন?

মহিলা ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—আপনারা?

সুবীরবাবু হয়তো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; পিকু শুধু বলে উঠল,—আমার বাবা হলেন জয়ন্ত চ্যাটার্জি।

—জয়ন্ত? মহিলা বিস্ফারিত চোখে পিকুর দিকে তাকালেন।

সুবীরবাবু বলতে শুরু করছিলেন,—বুঝিয়ে বলছি। জয়ন্ত চ্যাটার্জিকে আপনি চেনেন কিনা জানি না। খুব দু:খের ঘটনা। এ ছেলেটি যখন খুব ছোট, 2002-তে ওর বাবা—

ভদ্রমহিলা ডান হাত তুলে সুবীরবাবুকে থামিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন,—প্লিজ কাম ইন।

মহিলার পেছন পেছন সুবীরবাবু ও পিকু ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঢুকেই ড্রয়িংরুম। পুরোনো কার্পেট পাতা। বেশ কিছু জায়গায় কার্পেট ছিঁড়ে কাঠের মেঝে দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বহু পুরোনো একটা লেদার সোফাসেট।

সুবীরবাবু সোফাটা খুঁটিয়ে দেখে বসবেন কি বসবেন না ভাবছেন, এর মধ্যে ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল, —বসতে পারেন। ভেঙে পড়বে না।

সামনের রিক্লাইনারে হেলান দিয়ে বসে মহিলা বললেন,—আমি ডেভ জর্ডনের স্ত্রী। জুলি জর্ডন। ডেভ এয়ার ক্র্যাশে মারা যায় 2002-এ। একই ফ্লাইটে জয়ন্তও ছিল। ডেভের মৃত্যু আমার কাছে একটা বিশাল আঘাত। আজও বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাই না। বাড়ির চেহারা দেখেই টের পেয়েছেন হয়তো। সময় এখানে গত কুড়ি বছর ধরে থেমে আছে। বলে জুলি একটু থামলেন।

জুলি ফের বলে উঠলেন,—জয়ন্ত আমাদের খুব ক্লোজ বন্ধু ছিল। ও ছিল ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট। কোনওদিন নোবেল প্রাইজ পেলেও অবাক হতাম না।

পিকু অবাক হয়ে বলল,—আচ্ছা, বাবা তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বলে আমরা জানতাম।

জুলি কষ্ট করে হেসে বললেন,—ও ওর আসল পরিচয়টা লুকোত। কেন জানি না। এমনকী বিতানও ওর কাজের ব্যাপারটা কতটা জানত জানি না। বিতানই তো তোমার মায়ের নাম, তাই না?

পিকু মাথা নেড়ে সায় দিল।

জুলি বললেন,—ওর রিসার্চের সাবজেক্ট ছিল বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এ বিষয়ে ও ছিল প্রথম সারির বিজ্ঞানী। ও আর ডেভ মিলে ডিএনএ সিকোয়েন্সের ওপর বেশ কিছু অসাধারণ গবেষণা করেছিল। শুধু মানুষ নয়, নানান জন্তু-জানোয়ারও ডিএনএ-এর ঠিক কী বৈশিষ্ট্যের জন্য কী স্পেশাল ক্ষমতা পায়—তা নিয়েও ওদের গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছিল। এই যেমন ধরো, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি কিংবা গিরগিটির রং বদলানোর ক্ষমতা, বা পুমার লাফানোর ক্ষমতা—এ তো তাদের ডিএনএ-র বিশেষ সিকোয়েন্সেরই জন্য। ডেভ আর জয়ন্ত সেই সিকোয়েন্স কী তা প্রায় জেনে গিয়েছিল। মানুষের ডিএনএ-তে কীভাবে সেই একই পরিবর্তন আনা যায় তা নিয়ে ছিল ওদের গবেষণা।

—কিন্তু এসব রিসার্চ তো এখন নিষিদ্ধ। সুবীরবাবু বললেন।

—আমি তো এখনকার কথা বলছি না। তখন এসব নিষিদ্ধ ছিল না। এসব করলে কী সাংঘাতিক ফলাফল হতে পারে তার সম্বন্ধে কেউ সচেতন ছিল না।

—তা এসব করে লাভ কী হত? সুবীরবাবু ফের প্রশ্ন করলেন।

—কী আবার! মানুষ যদি ঈগলের মতো দূর থেকে দেখতে পেত—বা আঙুল কেটে গেলে নিজের থেকে তৈরি করতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হত, তাই না? কেউ যদি চিতাবাঘের মতো দৌড়োতে পারত আর সিংহের মতো শক্তিশালী হত তাহলে তাকে কি আর সাধারণ মানুষ প্রতিযোগিতায় হারাতে পারত? হয়তো ওরা অতিমানব তৈরি করার চেষ্টা করছিল।

—কিন্তু আমার বাবাই কখনই এরকম কিছু করতে পারে না। বাবাইকে যতটুকু দেখেছি, বাবাই সম্বন্ধে যা শুনেছি—বাবাই কখনও অন্যায় কিছু করত না। এভাবে অতিমানব তৈরি করা এতো একধরনের অন্যায়। সাধারণ মানুষ কি টিকে থাকতে পারবে এদের সঙ্গে লড়াই করে?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। জয়ন্ত নিজের ইচ্ছেতে এরকম কিছু করত না। ও মানুষ হিসেবেও ছিল খুব বড়। দার্শনিকের মতো কথা বলত মাঝেমধ্যে। খুব দূরদৃষ্টি ছিল। আমার মনে হয় না ওরা এই ভুল করত। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হত ওরা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল শেষের কয়েকটা বছর। কেউ যেন আড়াল থেকে ওদের কন্ট্রোল করত। ডেভ আমার সঙ্গে কোনও কথা বলত না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যেত। কলিংবেল-এর আওয়াজে নার্ভাস হয়ে পড়ত। অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলে ধরত না।

—এটা কোন সালের কথা?

—এই ধরো, 2000 থেকে 2002—এই দু-বছর। তখন ওকে আমি দেখেছি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেতে।

—আমার বাবা তো ওই সময় ভারতে চলে যান।

—হ্যাঁ, কিন্তু ও এখানে প্রায়ই আসত। ওরা দুজনে মিলে ওপরের ঘরে বসে অনেক রাত অবধি কীসব আলোচনা-গবেষণায় ব্যস্ত থাকত। এখানে তোমাদের একটা বাড়িও ছিল, তা জানো তো? সেখানেও ডেভ আর জয়ন্ত অনেক সময় একসঙ্গে কাটাত। তারপর একদিন হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। এয়ার ক্র্যাশে।

জুলি থামলেন। ঘরে পিনড্রপ সাইলেন্স। খানিকবাদে পিকুই নীরবতা ভঙ্গ করল।

—আপনি গিয়েছিলেন ক্র্যাশ সাইটে?

—হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তো ওরা একেবারে কাছে যেতে দেয়নি। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছিল ওরা।

—ডেডবডি দেখেছিলেন?

—সবাই এত পুড়ে গিয়েছিল যে কাউকে চেনার উপায় ছিল না। তবে ক্রেডিট কার্ড, আইডি—এসব থেকে ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন টিম ওদের সনাক্ত করে। তবে ওরা যে মারা গিয়েছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

—আপনার কি সত্যিই কোনও সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে? পিকু বলে উঠল। ওর কেন জানি না মনে হল ভদ্রমহিলা নিজেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তা না হলে হঠাৎ ওকথা বললেন কেন?

খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে পিকুর দিকে তাকিয়ে রইলেন জুলি। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কফি চলবে? কফি খেতে খেতে বলব।

ঘরের পরিবেশ বেশ ভারী হয়ে আছে। সেই ভার খানিকটা কাটাতেই পিকু সায় দিল।

খানিকবাদে কফি, কিছু স্ন্যাকস আর সসেজ নিয়ে ফিরে এলেন জুলি। পিকুর কেন জানি না মনে হল বহু বছর বাদে জুলি যেন কথা বলার লোক খুঁজে পেয়েছেন। যে সব কথা কাউকে কোনওদিন বলা যায়নি, সেসব যেন বলার সময় এসেছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে জুলি বলে উঠলেন,—আচ্ছা কেউ কি এরকম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার আগে মৃত্যু টের পায়? আমার কেন জানি মনে হয় ডেভ বুঝতে পেরেছিল যে আমাকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যাবে। তাই ওর সব ভালোবাসা-দরকারি সব কথা ও যেন জানিয়ে গিয়েছিল শেষের ক'দিনে। দরকারি সব কম্পিউটারের ফাইল নিউইয়র্কে যাওয়ার কয়েকদিন আগে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি তখন খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম।

—নিউইয়র্ক?

—হ্যাঁ, ও শেষ এক সপ্তাহ নিউইয়র্কে ছিল। একটা মেডিক্যাল কনফারেন্সে। সেখান থেকে ফিরতে গিয়েই এই এয়ারক্র্যাশ হয়। তোমারও কি তোমার বাবার সম্বন্ধে একথা মনে হয়েছিল?

পিকুকে চুপ থাকতে দেখে জুলি ফের বলে উঠলেন,—অবশ্য তুমি আর কী বুঝবে? তুমি তো তখন অনেক ছোট।

পিকু একটু চুপ থেকে বলল,—ছোটবেলায় কিছু বুঝতে না পারলেও সম্প্রতি আমারও একই কথা মনে হয়েছিল, আর তাই আমি এখানে—

বলে ও ছোটবেলার লুডোর কথাটা খুলে বলল।

মন দিয়ে শুনে জুলি বললেন,—এই এয়ারক্র্যাশটার ব্যাপারে যে চিফ ইনভেস্টিগেটর ছিল তার সঙ্গে আমি দেখা করি। প্রথমে কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু আমি কয়েকমাস ধরে লেগে থাকি। জানতে পারি ওনার বেশ কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ওনারও মনে হয়েছিল ফ্লাইটে কোনও ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। অজানা কারণে ব্ল্যাকবক্সে কিছুই ধরা পড়েনি। টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি-ও হতে পারে। কিন্তু ওনাকে সেটা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া উনি দেখেছিলেন সেদিনকার ওই ফ্লাইটে ফাইনালি কারা উঠেছিল সেই নামের লিস্টও নেই। ওনার মনে হয়েছিল যে কেউ যেন ওই ডেটা এয়ারলাইনস-এর ডেটাবেস থেকে ইচ্ছে করেই উড়িয়ে দিয়েছে যাতে কেউ না জানতে পারে প্লেনে কে কে ছিল।

—আশ্চর্য! কিন্তু আপনি এটা জানার পর কিছু করেননি?

—চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ইনভেস্টিগেশন জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

কফির কাপটা টেবিলের ওপর রেখে জুলি যেন প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যই বললেন,—তা, তোমার নাম কী?

—পিকু।

—বাহ, সুইট নেম। তোমার বাবার কথা নিশ্চয়ই খুব মনে পড়ে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিকু বলে,—আচ্ছা আমার দাদাকে কি আপনি দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, তোমার দাদা এখানেই মারা যায়, চার কি পাঁচ বছর বয়সে। তখন তোমার বাবা-মা কলোরাডোতে। খুব সম্ভবত 1996-এ। হঠাৎ দুদিনের এক অজানা জ্বরে তোমার দাদা মারা যায়। ভারি মিষ্টি ছিল ছেলেটা। তোমার বাবা-মা খুব ভেঙে পড়েছিল। প্রথম সন্তান বলে কথা! তোমার বাবা ওর ডিএনএ পর্যন্ত সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছিল। তুমি বাড়িতে ওর কোনও ছবি দ্যাখোনি?

—না, আগে দেখিনি। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়াতে একটা আলমারির ভেতর থেকে প্রথম ওর একটা ছবি পাই। প্রথমে ভেবেছিলাম আমারই ছোটবেলার ছবি। পরে খুঁটিয়ে দেখে বুঝি যে ওটা আমার নয়, কিন্তু অবিকল আমারই মতো দেখতে।

—তোমারই মতো? দ্যাট মিনস—বলে চুপ করে গেলেন জুলি।

—কী?

—দ্যাট মিনস—তুমি হোচ্ছ তোমার দাদার ক্লোন। তোমাদের দুজনেরই একই ডিএনএ। তাই একরকম দেখতে। তোমার দাদার ডিএনএ তো ছিলই। তা থেকে ক্লোনিং টেকনোলোজি ব্যবহার করে সেই ভ্রূণ থেকে তোমাকে তৈরি করা হয়। ক্লোনিং কী করে করতে হয় তা জয়ন্ত তার মানে জেনে গিয়েছিল।

—1997-এ ক্লোনিং! হেসে উঠলেন সুবীরবাবু।

—অন্য কেউ হলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। এখনই যেটা সম্ভব হয়নি তা পঁচিশ বছর আগে! জুলি একটু থেমে ফের বলেন, জয়ন্ত ওর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। বুদ্ধির দিক থেকে ও নিজেই ছিল অতিমানব। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এখনও আমার মনে পড়ে ও আর বিতান তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর কীরকম ভেঙে পড়েছিল। তার কিছুদিন পরের কথা, আমরা জানতে পারি যে জয়ন্ত তোমার দাদার ডিএনএ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। তখন আমি জিগ্যেস করতে তোমার বাবা বলেছিলেন, 'আমি শান্তনুকেই ফিরে পেতে চাই। ছেলে হলে ওরকমই ঠিক হতে হবে। আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই।' কথাটার মধ্যে এমন একটা একগুয়েমি ছিল যে আমি খুব অবাক হয়ে যাই।

—আমারও ছোটবেলাতে কেন জানি মনে হত আমার সঙ্গে অদৃশ্য কারুর যেন তুলনা চলছে। আমি যেন ঠিক তারমতো হলে বাবা-মা খুব খুশি হন। বলতে বলতে থেমে গেল পিকু।

যেখানে পিকু বসেছে তার সামনেই ইউরোপিয়ান ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বড় জানলা। খানিকটা দূরে একটা ওক গাছ। ও দিকটা পুরো জঙ্গল হয়ে আছে। কেন জানে না ওর মনে হল গাছের ঝোপের মধ্যে কেউ একটা দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে লক্ষ করছিল। দ্রুত অন্য একটা ঝোপের পেছনে চলে গেল। মনে হল লোকটার গায়ের রং যেন সবুজ। আর তাই আগে চোখে পড়েনি। জানলার কাছে গিয়েও চোখে কিছু পড়ল না।

কথাটা আর বলল না পিকু, কিন্তু আলোচনার সুর যেন কেটে গেল। আরও আধঘণ্টা পরে ওরা জুলির কাছ থেকে বিদায় নিল। জুলি গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলে উঠলেন,—আবার এসো। অনেকদিন বাদে মনে হল আমি যেন সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে পেরেছি। আমার নাম্বারটা রেখেছ তো? কোনও দরকারে ফোন কোরো। আমি ডেভ-এর পুরোনো ডায়েরি, অ্যালবাম ঘেঁটে দেখব যদি ওখান থেকে কোনও সূত্র মেলে। এর পেছনে বড় কোনও শক্তি, বড় কোনও রহস্য আছে। আমার মনে হয় ডেভ আর জয়ন্ত দুজনকেই মার্ডার করা হয়েছে। ওরা হয়তো সেটা আগে থেকেই টের পেয়েছিল। প্রশ্নটা এখানেই যে কেন ওদের মারা হল, আর সব জেনেও ওরা চুপ করে বসে রইল কেন? বিপক্ষশক্তি কি সত্যিই এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ওদের কোনও বাঁচার উপায়ই ছিল না? আমার এক বন্ধু ইউ এস সেক্রেটারি অফ ডিফেন্সকে ভালো করে চেনে। আমি তার সঙ্গে আবার কথা বলব, যাতে তদন্ত আবার চালু করা হয়।

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। সুবীরবাবু হঠাৎ করে 40 স্পিড লিমিটের রাস্তায় 100 তুলে বলে উঠলেন,—বুঝলে পিকু, সারা জীবনটা বড্ড একঘেয়ে ভাবে কাটালাম। রোজই এক রুটিন। রোজই নিয়ম মেনে সব কিছু করা। না আছে কোনও চমক, না আছে কোনও অ্যাডভেঞ্চার। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে বড় একটা রহস্যের মধ্যে ঢুকে গেছি।

ওনার জেমস বন্ড স্টাইলের ড্রাইভিং অবশ্য বেশিক্ষণ চলেনি। পেছনে লাল-নীল আলো জ্বেলে একটা পুলিশের গাড়ি তাড়া করেছে। পরের আধঘণ্টা ঠিক রুটিনমাফিক হয়নি।

রবার্ট ওর কম্পিউটারে অফিসের পুরোনো ফাইলগুলো দেখছিল। সিআইএ-র ডিরেক্টর হিসেবে ওর হাতে বেশ কিছু পুরোনো প্রোজেক্টের ইনফরমেশন এসেছে। বেশিরভাগই খুব সেনসিটিভ ডেটা। প্রত্যেকটা ফাইল খোলার আগে ডানহাতের পাঁচটা আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর রেটিনা স্ক্যান করার দরকার হচ্ছে। তা ছাড়া নানান ধরনের পাসওয়ার্ড তো আছেই।

প্রসেসটা খুব স্লো। কিন্তু উপায় নেই। সাবধানতার কোনও বিকল্প নেই। প্রত্যেকটা প্রোজেক্টের ইনফরমেশন ওর জানা দরকার। অন্যান্য অফিসের মতো আগের বিদায়ী ডিরেক্টর কোন প্রজেক্টের কী স্ট্যাটাস তা বুঝিয়ে হ্যান্ডওভার করবে—তা তো আর CIA-তে হয় না! ইনফ্যাক্ট আগের জন কে ছিলেন, তাও জানে না রবার্ট। এতটাই গোপনীয়তার সঙ্গে এখন পুরো তথ্য লুকিয়ে রাখা হয়। এখানে যার যতটুকু জানা দরকার, তার থেকে একটুও বেশি কেউ জানবে না।

গত এক সপ্তাহে বাকি সব প্রোজেক্টের লেটেস্ট স্ট্যাটাস জেনে নিয়েছে রবার্ট—শুধু একটা বাদে। প্রোজেক্ট এইচ। ফাইলটা ব্ল্যাঙ্ক। ওই একটা অক্ষরের বাইরে কোথাও কোনও ইনফরমেশন নেই। অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের লিস্টে 'প্রোজেক্ট এইচ' নামটা দিব্যি জ্বলজ্বল করছে।

একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করলেন রবার্ট। বিশেষভাবে সুরক্ষিত হেল্পডেস্ক। একটা স্পেশাল কোড আর বায়োমেট্রিক স্ক্যানের পরে 'প্রোজেক্ট এইচ'-এর তথ্য জানানোর জন্য অনুরোধ করলেন রবার্ট। উলটোদিক থেকে যান্ত্রিক গলায় একটা কোড শোনা গেল। বিশাল বারো ডিজিটের কোডটা শোনার পর অবাক হয়ে বসে রইলেন রবার্ট। কোড থেকে একটা জিনিসই জানা যাচ্ছে যে প্রোজেক্ট এইচ খুবই গোপনীয় কোনও প্রোজেক্ট। এই প্রোজেক্টের ইনফরমেশন পেতে রীতিমতো কাঠখড় পোড়াতে হবে।

ফোনে রিং হচ্ছে। ফোনটা ধরলেন রবার্ট।

—হ্যালো।

—কোডটা জানান। যান্ত্রিক গলা বলল।

ফোনের কি প্যাডে কোডটা ডায়াল করলেন রবার্ট। খানিক আগেই পাওয়া প্রোজেক্ট এইচ-এর কোডটা। আরও নানান ধরনের ভেরিফিকেশনের পর উলটোদিক থেকে শোনা গেল—প্রোজেক্ট এইচ হচ্ছে সিআইএ ও ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সির (DARPA) যুগ্ম উদ্যোগে একটা বিশেষ প্রোজেক্ট। মূল উদ্দেশ্য যুদ্ধের জন্য স্পেশাল আর্মি তৈরি করা,—যারা বুদ্ধিতে, শক্তিতে, গতিতে সাধারণ সৈন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে।

—উদ্দেশ্য?

—যাতে আমেরিকা যে-কোনও বিদেশি শক্তির বা টেররিস্ট আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আর পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, কখনও যদি মানুষের অস্তিত্ব রোবট বা যান্ত্রিক শক্তির কাছে বিপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে এরাই হবে ভরসা।

—এ প্রোজেক্ট কি আমারই আন্ডারে পড়বে?

—অবশ্যই, তা না হলে এতটা ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হত না।

—তা প্রোজেক্টের বর্তমান অবস্থা কী?

—শেষের দিকে। শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

—কোথায় হচ্ছে প্রোজেক্টটা?

—জানানো যাবে না।

—কিন্তু আমি না জানলে চলবে কী করে?

—দরকার মতো প্রোজেক্টের স্ট্যাটাস আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কোনওভাবে কাউকে এ প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানানো যাবে না।

—এ প্রোজেক্ট কবে শুরু হয়েছিল? কার আন্ডারে আছে?

—2001-এর 11 সেপ্টেম্বরের পরে এ প্রোজেক্ট শুরু হয়। তিনজন DARPA-র বিজ্ঞানী আর দুজন সিনিয়ার মিলিটারি অফিসার নিয়ে এর কোর টিম। তারাই এ প্রোজেক্ট পরিচালনা করে।

—তাদের পরিচয় জানা যাবে?

—না।

—প্রেসিডেন্ট কি এ প্রোজেক্টের ব্যাপারে জানেন?

—খুব সামান্য। আপনিও ঠিক যতটা জানলেন। ওই কোর টিমের বাইরে কেউ এই প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানে না।

—আপনার নাম? আপনিও কি এ প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

উলটোদিকের ফোন কেটে গেল।

—ননসেন্স! বলে রবার্ট উঠে দাঁড়ালেন। দায়িত্বও নিতে হবে, আবার কোনও কিছু জানাও যাবে না। কোনও মানে হয়? সেক্রেটারি পলকে ঘরে ডেকে নিলেন রবার্ট।

—পল, প্রোজেক্ট এইচ-এর যাবতীয় ইনফরমেশন আমার চাই। গত একসপ্তাহ ধরে আমার যত সোর্স ছিল আমি ভালো করে দেখেছি—তেমন কোনও তথ্য নেই। তুমি তো অভিজ্ঞ লোক। আশাকরি বলতে হবে না, কী করে এর সম্বন্ধে ডিটেলস বার করতে হয়। দরকার হলে আমাদের দেশের বেস্ট কম্পিউটার হ্যাকারদের নিয়োগ করো। আই মাস্ট হ্যাভ দিস ইনফরমেশন।

—ঠিক আছে। রবার্টের স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পল বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারল। আর কোনও প্রশ্ন না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

১৪

রাত বারোটা। লাসভেগাস। শহর যেন সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। আলোর রোশনাই মুখ থুবড়ে পড়েছে চওড়া চওড়া রাস্তায়। ঝকমকে আলো, হাজারো পথচারী, লাসভেগাস বুলেভার্ডের ধারে আলোয় ভাসা ফোয়ারা—সবমিলিয়ে চারদিকে উৎসবের আবহ। এখানে কেউ কোন দিকে যাচ্ছে তা জেনে হাঁটে না—কী দেখতে যাচ্ছে ভেবে এগিয়ে যায় না। পুরো শহরটাই ঘুরে দেখার। আনন্দের উত্তাপই এখানে বড় প্রাপ্তি। চারদিকে আকাশচুম্বী হোটেল আর ক্যাসিনো। নানান ধরনের শো হচ্ছে। সাধারণ লোকের সঙ্গেই মিশে আছে পুলিশের লোক। রোবট পুলিশ কন্ট্রোল করছে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো ট্রাফিককে। এখানে প্রতি মুহূর্তে কোটি টাকা হাত বদলাচ্ছে ক্যাসিনোর মধ্যে।

এরকমই একটা ক্যাসিনোর নাম হল 'লা রোমা'। ঝাঁ-চকচকে হোটেলের পুরো নীচের ফ্লোরে প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে বিশাল ক্যাসিনো। ক্যাসিনোর ভেতরে প্রচুর সিকিউরিটি জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে অত্যাধুনিক বন্দুক। দরকার হলে গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।

জন এ হোটেলের সিকিউরিটি হেড হিসেবে প্রায় দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। অন্য বেশিরভাগ রাতের মতো আজকের রাতও ঘটনাহীন। পেশাদারি গ্যাম্বলারদের ভিড় বেশিরভাগ খেলায়। এরা কোটি কোটি টাকা বাজি ধরে খেলে। লক্ষ টাকা হারলেও এরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। কিছু নতুন অচেনা মুখ কৌতূহলী হয়ে মাঝেমধ্যে খেলছে।

সেরকমই একটা নতুন মুখকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখছে জন। ভারি সুন্দর দেখতে। ফরসা মাঝারি হাইট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত নীল চোখ। মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল। হাঁটাচলা দেখলেই বোঝা যায় সে ক্যাসিনোতে কখনও আসেনি। সবরকম খেলা ঘুরে ঘুরে দেখছে। নিয়ম বোঝার চেষ্টা করছে। টেবিলের শুটারদের মাঝেমধ্যে জিজ্ঞাসা করছে। এখানে এরকম অনেকেই আসে। কিন্তু জনের অভিজ্ঞ চোখ তাদের সবাইকে অনুসরণ করে না।

তার কারণ ছেলেটা খেলছে, আর নতুন হলেও বেশিরভাগই জিতছে। আর বেটও করছে বড় বড় টাকার অঙ্ক—যা বড় জুয়াড়ি ছাড়া কেউ করে না।

জন শুধু সিকিউরিটি হেড নয়, বিজ্ঞানের ভালো ছাত্র। এই খেলাগুলোর পেছনে ভাগ্য ছাড়াও বুদ্ধি কাজ করে। তার থেকেও বড় কথা যে এরকম বারবার জিতছে, সে কোনও চুরি করছে না তো? প্রযুক্তি এখন এতটাই এগিয়ে গেছে যে কে কীভাবে তাকে প্রয়োগ করে তাও বোঝা মুশকিল। এই তো মাসখানেক আগে একজন এখানে রেটিনাতে মিনি ভিডিয়ো রেকর্ডার ইমপ্ল্যান্ট করে এসেছিল।

ছেলেটা এক বোর্ডে বেশিক্ষণ খেলছে না। দু-তিনবার জেতার পরে অন্য বোর্ডে চলে যাচ্ছে। বোর্ডের চারদিকে লুকিয়ে রাখা আছে মাইক্রো-ভিডিয়ো ক্যামেরা। যে-কোনও জাল-কারচুপি ওতে ধরা পড়ে যায়। তাতেও খুঁটিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দেখল জন। নাহ, ছেলেটার কাছে তো সেরকম কোনও যন্ত্র নেই!

ছেলেটা এবার স্কিল জোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগের ক্যাসিনোর গেমগুলোতে ভাগ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল। যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন, ভাগ্য সঙ্গে না থাকলে জেতা শক্ত। কিন্তু স্কিলজোন অন্যরকম। এই গেমে লাকের থেকে আগে থাকে স্কিল, ইনটেলিজেন্স।

ছেলেটা ওখানে গিয়েও একের পর এক জিততে শুরু করল। কালার রেস। একটা গোলাকার জায়গার নানা অংশে বারবার নানান রং ফুটে উঠছে খুব দ্রুত। দু-মিনিটের মধ্যে কোন রং কতবার হয়েছে সেটা বলতে হবে।

যে ঠিক সংখ্যার সব থেকে কাছাকাছি বলবে সে জিতবে। ছেলেটা এটাও তিনবার জিতল। তারপর প্রায় বিরক্ত হয়েই পাশের গেমটার দিকে এগিয়ে গেল। নাম্বার সিকোয়েন্স গেম। একটার পর একটা সংখ্যা ফুটে উঠেছে, আর তার মধ্যে আছে দুর্বোধ্য প্যাটার্ন। মাঝে মাঝে ওই সিকোয়েন্সের পরের সংখ্যাটা অনুমান করতে হচ্ছে। সময় খুব কম। তারমধ্যে যে আগে ঠিক বলতে পারবে সেই জিতবে।

জন জানে যে এসব গেমে যারা যোগ দেয় তারা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে এক্সপার্ট। মাসের পর মাস—বছরের পর বছর প্র্যাকটিসের পরে এখানে আসে। বিশেষ করে এসব ক্যাসিনোতে এসে যারা বেটিং করে তারা সবরকম সাবধানতা নিয়েই নামে। কিন্তু এ ছেলেটা এসে যেন আজকে সবার প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এটাও হেসেখেলে দুবার জিতে নিল। তারপর আরেকটা বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার জন এগিয়ে এল। আর আড়াল থেকে দেখার দরকার নেই। নিশ্চিত কিছু গন্ডগোল আছে। জনকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও এখানকার সিকিউরিটিতে আছে। সাধারণ পোশাক।

জন ছেলেটার কাছে গিয়ে বলে উঠল,—বাহ, তুমি তো দেখলাম অসাধারণ প্লেয়ার। একের পর এক জিতছ। তোমার নাম কী?

—পল। একঝলক জনের চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল ছেলেটা। তারপর অন্য কোনও বোর্ডের দিকে না তাকিয়ে ক্যাসিনোর ফ্লোর থেকে বেরোতে গেল।

জন দ্রুত পায়ে পিছু নিয়ে ফের বলে উঠল,—তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—ক্যালিফোর্নিয়া।

—আমি এখানকার সিকিউরিটি। তোমার আইডিটা দেখি।

ছেলেটা কোনও দ্বিধা না করে ওয়ালেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বার করে তুলে ধরল। জন একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। নাহ, আইডিতে কোনও গন্ডগোল নেই। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের লাইসেন্স। ছেলেটার বয়স

মোটে কুড়ি। তবু একে এত সহজে ছাড়া যাবে না। জানা দরকার কীভাবে সমানে জিতে চলেছে।

—তুমি আমার সঙ্গে একবার আমাদের সিকিউরিটি রুমে চলো। দরকার আছে।

জন ভেবেছিল যে ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভয় দেখাতে হবে। বলপ্রয়োগেরও দরকার হতে পারে। তাই এক বিশালদেহী গার্ডকে ইতিমধ্যেই ডেকে নিয়েছিল। কিন্তু তার কোনও দরকার হল না। ছেলেটা বেশ হাসিমুখেই ওর পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

বিশালদেহী কালো গার্ডটা ছেলেটার পাশে পাশে হাঁটছিল। এসক্যালেটরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ পেছনে একটা আওয়াজ হল। জন মাথা ঘুরিয়ে দেখল যে গার্ডটা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

জন দেখতে না পেলেও আরেকটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন গার্ডের চোখ এড়ায়নি ঘটনাটা। সে আঙুল তুলে ছেলেটার দিকে ছুটে এল।

—ও ঘুষি মেরে জোকোকে ফেলে দিয়েছে।

বলে রিভলভারটা ছেলেটার দিকে তুলে ধরল। তুলে ধরার চেষ্টা করল বলাই ভালো। কারণ, তার আগেই ছেলেটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ওর হাত ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান দিল যে গার্ডটা পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। আর কেউ এগিয়ে আসার আগেই তিন-চার লাফে কুড়ি ধাপের সিঁড়ি টপকে বেরিয়ে গেল। ক্যাসিনো থেকে বেরোনোর দরজা বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু খানিকটা ছুটে গিয়েও জন বা কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছেলেটার টিকিও আর দেখতে পেল না। কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গেছে যেন।

১৫

সুবীরবাবু মিসিগান ইউনিভার্সিটি দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন পিকুকে। বহু পুরোনো ইউনিভার্সিটি। চারটে জায়গায় ছড়ানো ক্যাম্পাস। নর্থ, সাউথ, সেন্ট্রাল আর মেডিক্যাল। পুরোনো বিল্ডিংগুলোর পাশাপাশি নতুন বিল্ডিং হয়েছে একই ধাঁচের। এমনভাবে তৈরি করেছে যে কোনটা পুরোনো আর কোনটা নতুন ভেতরে না ঢুকলে বোঝার উপায় নেই। ওখানে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়ে ইউনিভার্সিটির আশেপাশের এলাকা দেখাতে শুরু করলেন সুবীরবাবু।

ইউনিভার্সিটি ছেড়ে খানিকটা এগোতে হঠাৎ পিকু দেখল পাশের একটা সরু রাস্তা ব্লক করে রাস্তাতে চেয়ার টেবিল পেতে চেস খেলা হচ্ছে। এরকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না, গাড়ি পার্ক করে ওরা দুজনেই নেমে এল।

ওপেন চেস টুর্নামেন্ট। যে কেউ খেলতে পারে। সবে শুরু হয়েছে, চলবে রাত অবধি। পুরস্কার মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। একটা লোকাল কোম্পানি স্পনসর করছে।

—কি, খেলবে নাকি? সুবীরবাবু জিগ্যেস করলেন।

—হ্যাঁ, খেললে খারাপ হয় না। আমি খারাপ খেলি না।

—তা খেলো না! আমিও বসে বসে দেখি। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ওই তো দর্শকদের বসার জায়গাও আছে।

দাবাটা চিরকালই পিকুর প্রিয় খেলা। বাবাও নাকি খুব ভালো দাবা খেলত। পিকু স্কুলে বরাবর চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে। তবে বড় টুর্নামেন্ট কখনও খেলেনি। খানিকক্ষণের মধ্যে পিকুও যোগ দিল। আর জিততেও শুরু করল। স্পিড চেস। একেকটা ম্যাচ দশমিনিটের।

বেশিরভাগই সাধারণ মানের প্লেয়ার। চারটে রাউন্ডের পরে সেমিফাইনাল। সেমিফাইনালে উঠে একটা ছেলের কাছে পিকু হেরে গেল। সেই ছেলেটাই পরে টুর্নামেন্টটা জিতল। অসাধারণ খেলে। চাল দিতে এক

সেকেন্ডও টাইম নেয় না। সেরকমই বুদ্ধির ছাপ চালে। পিকু ভেবে রেখেছিল টুর্নামেন্টের পরে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সুবীরবাবুর দিকে। খানিকদূরে একজন মোটা গোলগাল চেহারার সাহেবের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসে আছেন। সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে আর সেই অশ্রুসজল চোখে সাহেব পিকুর দিকেই তাকিয়ে আছে। আন্দাজ করতে দেরি হল না কী হয়েছে। সুবীরবাবু হাত নেড়ে পিকুকে ডাকলেন।

—এনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিসিগান ল স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। সাইমন। তোমার কথাই হচ্ছিল।

সাইমন কোনও কথা না বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পিকুকে।

—ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন। বাবার খোঁজে দশ বছর ধরে তুমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আর আমি কীরকম অভাগা দেখ! আমার ছেলে একই শহরে থাকে—অথচ খোঁজই নেয় না।

ভদ্রলোকের কান্না একটু কমলে পাশ থেকে সুবীরবাবু বলে উঠলেন,—যে ছেলেটা জিতল তার নাম ড্যানিয়েল। ও পড়াশোনাতেও নাকি খুব ভালো। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। প্রথম হয়। ওর সঙ্গে যাকে সবসময় দেখা যায়,—ওর সেই বন্ধু আজকে আসেনি। সে আবার সম্প্রতি নাকি এখানকার একটা রেসে একশো মিটারে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙেছে। তা নিয়ে এখনও অনেক কাগজে লেখালেখি চলছে। সে-ও পড়াশোনায় খুব ভালো।

সাহেব বসে চোখমুখ রুমালে মুছতে মুছতে বলে উঠলেন,—ওরা দুজনেই একটা অরফ্যানেজে বড় হয়েছে। তোমারই মতো। দুজনেই অসম্ভব ট্যালেন্টেড। অলরেডি বেশ কিছু পাথব্রেকিং রিসার্চও করছে। তা তুমিও তো খুব ভালো খেলছিলে। ওই ছেলেটা না থাকলে তুমিই জিততে।

একটু থেমে সাইমন সুবীরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমি ইউনিভার্সিটির সব ইনফরমেশন ঘেঁটে দেখব। যদি পিকুর বাবার কোনও খোঁজ পাই, জানাব। আজ উঠি। ওকে দেখলেই...। বলে আবার কেঁদে ফেললেন, আরেকবার পিকুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পিকু সুবীরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—আপনি কী কী বলেছেন বলুন তো? দশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে খুঁজছি! সারা শহরকে কাঁদিয়ে বেড়াচ্ছেন!

—আহা, ওই হল। উনিশ-বিশ। চলো গাড়িতে ওঠা যাক। সারাদিন আজ বেশ কাটল। সাইমন লোকটাও বেশ ভালো।

গাড়ির দিকে দুজনে এগোতে যাবে, দেখতে পেল টুর্নামেন্টে জেতা ছেলেটা পাশেই ওর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। পিকুকে দেখে এগিয়ে এল। হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল—আমি ড্যানিয়েল।

—তুমি খুব ভালো খেলছিলে। আমি না থাকলে তুমিই জিততে। তুমি কি এখানেই থাকো?

—না, আমি এখানে একটা রিসার্চের কাজে এসেছি। তুমি তো শুনলাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্ট। খুব ভালো রিসার্চ করছ।

—হ্যাঁ, ওই আর কী! দাবাটা হল আমার প্রাণ। তা, তোমার সঙ্গে যে জন্য কথা বলতে এলাম,—আমি যেখানে বড় হয়েছি, সেখানে একজনকে চিনতাম যাকে দেখতে ঠিক তোমার মতো। খুব আশ্চর্য মিল।

—তুমি বড় হয়েছ কোথায়?

—ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে এক অরফ্যানেজে। যার কথা বলছি সে আমাদের থেকে কয়েকবছর বড়। এক কাজ করা যাক, চলো। আজ তো আর তেমন কথা বলা গেল না। খুব ক্লান্ত লাগছে। একদিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

বলে ছেলেটা একটা ছোট কাগজে ওর নাম্বার আর ঠিকানা দিয়ে বলে উঠল,—একবার ফোন করে চলে আসবে। এখান থেকে খুব কাছেই। পিকুও ওর ঠিকানা কাগজে লিখে দিল। হ্যান্ডশেক করে এবারে ছেলেটা ওর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠেই সুবীরবাবু বলে উঠলেন—কি সাংঘাতিক ছেলে রে বাবা ড্যানিয়েল! চাল দিচ্ছিল কি স্পিডে! তুমি ছাড়া আর কেউ দু-মিনিটও টিকতে পারেনি। এক একবার সাইমনের দিক থেকে চোখ সরাই, দেখি ছেলেটা আরেকজনের সঙ্গে খেলতে বসে গেছে। যারা ভালো হয়, সবেতে ভালো হয়।

পিকু যেন শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কোথাও কি দেখেছে আগে ছেলেটাকে? একবার জুলির সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ও সুবীরবাবুকে বলল,—আচ্ছা, মিসেস জুলিকে একবার ফোন করে দেখবেন—কোনও খবর পেয়েছেন কিনা। কাল যখন কথা হল তখন উনি বলেছিলেন যে উনি চেনাজানার মাধ্যমে আপিল করবেন এয়ারক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন ফের চালু করার জন্য।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। একবার ফোন করে দেখি। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে জুলির নাম্বার ডায়াল করলেন সুবীরবাবু। ফোনটা অনেকক্ষণ রিং হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাদ দিয়ে আবার ডায়াল করলেন। ফের অনেকক্ষণ রিং হয়ে গেল।

—এত তাড়াতাড়ি তো শুয়ে পড়ার কথা নয়। একবার ওনার বাড়িতে যাওয়া যাবে? পিকু বলে উঠল।

—এখন? রাত ন'টার সময়?

—হ্যাঁ, গিয়েই দেখা যাক না! আমার মনে হচ্ছে ওনার কিছু বিপদ হয়েছে।

ওরা সুবীরবাবুর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল। সুবীরবাবু গাড়ি ঘোরালেন। যখন জর্ডনদের বাড়িতে ওরা পৌঁছোল তখন রাত প্রায় দশটা। বাগানের কয়েকটা আলো জ্বলছে, তবে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তারা ম্রিয়মান। চারদিকে অনাদরে বেড়ে ওঠা গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বাড়িটাকে দেখলে কেমন রোমাঞ্চ হয়। মনে হয় জীবনের চঞ্চলতা থেকে বহুদূরে একা যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। বেল বাজাল ওরা।

আগের দিনও ওনার দরজা খুলতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রায় দশমিনিট কেটে গেল। বারবার বেল বাজানো সত্বেও কোনও উত্তর নেই। তাহলে কি জুলি বেরিয়েছেন? কিন্তু গাড়ি তো গ্যারেজেই! জুলি সেলফোনেও সাড়া দিচ্ছেন না।

বাধ্য হয়ে 911 ডায়াল করলেন সুবীরবাবু। পাঁচমিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। দরজা খুলে পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা।

জুলি রিক্লাইনারে হেলান দিয়ে নিস্পন্দভাবে বসে আছেন। মুখটা একদিকে কাত। দেখেই বোঝা যায় প্রাণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল। ওখানেই ডাক্তাররা ওনাকে মৃত ঘোষণা করল। ঘণ্টা তিনেক আগে জুলি মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাকে।

সুবীরবাবু ও পিকু যখন হাসপাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, রাত তখন তিনটে। গাড়িতে প্রায় একঘণ্টা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি।

ঘরে ঢোকার পরে সুবীরবাবুই প্রথমে কথা বললেন।

—যতই বলুক হার্ট অ্যাটাক, আমার সন্দেহ হচ্ছে। কালই ফোনে যখন কথা হল, তখনই উনি বললেন একটা দরকারি জিনিস খুঁজে পেয়েছেন। ডেভের লেখা একটা ছোট নোট। তাতে 'পাম স্প্রিং' বলে একটা জায়গার উল্লেখ ছিল। এটা নাকি নিউইয়র্ক যাওয়ার দু-তিনদিন আগে লেখা। তার নীচে জয়ন্তর নামও ছিল। আমি যখন আরও জিগ্যেস করলাম, উনি ফোনে বলতে দ্বিধা করলেন। বললেন দেখা হলে বলবেন।

—তা আপনি আগে বলেননি কেন?

—তখন কি আর মারা যাবেন বুঝেছি! ভেবেছিলাম দু-একদিনে তো যাবই।...জুলির মৃত্যু সম্বন্ধে তোমারও কি সন্দেহ হয়?

—এটা হার্ট অ্যাটাক নয়। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার। আর একটা কথা বলে রাখি। আমরাও ওদের টার্গেট। ওরা যে-কোনওভাবে আসল সত্য লুকোতে চায়। বাবাই-এর রিসার্চ থেকে এয়ারক্র্যাশ—আসল

ঘটনা যেন কোনওভাবে প্রকাশ না হয়।

—হুঁ: ! বলে সুবীরবাবু পিকুর দিকে এগিয়ে এসে বললেন,—কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমার সঙ্গে আছি। এই ডালরুটির জীবনে আমার এমনিতেই আগ্রহ নেই। রহস্য উদ্ধার করতেই হবে। যে-কোনও মূল্যে।

একটু থেমে সুবীরবাবু ফের বলে উঠলেন,—আরেকটা কথা। আমাকে সব কথা বলো। এই যেমন তোমার ছোটবেলার লুডোর কথাটা আমাকে আগে বলোনি। খুব বড় রহস্য বুঝলে! দাঁড়াও সবগুলো পয়েন্ট একটু একজায়গায় নোট করে নিই।

বলে ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা একটা ছোট নোটবুক বার করে লিখতে থাকলেন।

এক, তোমার লুডোতে কী ভেবে তোমার বাবা ওই দুটো সংখ্যাতে আগে থেকে ক্রশ করলেন। আর তা কী করে মিলে গেল ওনার মৃত্যুর দিনের সঙ্গে!

দুই, ওনার মৃত্যুর পরে কে টাকা পাঠাল ইনোভেটিভ সলিউশনসের নামে।

তিন, তোমার বাবা কেন এত গোপনীয়তার সঙ্গে ওনার আসল পরিচয়টা তোমাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

চার, ওনার বন্ধু ডেভ জর্ডন—তিনিও কীভাবে টের পেলেন যে ওনারও সময় ফুরিয়ে আসছে।

পাঁচ, ডেভের লেখা নোটে আসলে কীসের উল্লেখ ছিল।

ছয়, জুলির মৃত্যু, জুলি কি কিছু টের পেয়েছিল?

সাত, তুমি ও তোমার দাদা। কেন তোমাকে ঠিক তোমার দাদার মতো দেখতে? উফ—অনেকগুলো খেয়াল করার মতো পয়েন্ট।

পিকু বলে উঠল—তা লিখছেন যখন—আরও লিখুন। আট-ড্যানিয়েল কী করে আমার নাম জানল?

—তাই নাকি? ওই চেস চ্যাম্পিয়ন ছোঁড়াটা?

—হ্যাঁ—খেলতে খেলতে হঠাৎ করে পিকু বলে ফেলেছিল। অন্যমনস্ক হয়ে পিকু ফের বলে উঠল—নয় নম্বর শুধু দাদা নয়। আমার মতো দেখতে আরেকজন কেউ কি আছে? যেমন ড্যানিয়েল বলল। সে-কে?

খানিকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে সুবীরবাবু বলে উঠলেন—হু:, জটিল রহস্য। তবে বুঝলেন, ডিটেকটিভ হিসেবে আমি খারাপ নই। কত রাত শার্লক হোমস, ফেলুদা, ব্যোমকেশের বই বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছি। আর ডিটেকটিভগিরি আমার রক্তেও আছে। আমার এক নিকট আত্মীয়—দাদুর মামাতো ভাইয়ের শালা পুলিশের বড় ডিটেকটিভ ছিল। তা আবার ব্রিটিশ আমলের সময়, ভাবো তো! দেখো এ-রহস্যের আমার হাতেই ফয়সালা হবে।

শুতে যাওয়ার সময় পিকু শুনতে পেল নীচের বেসমেন্ট থেকে আওয়াজ আসছে। উঁকি মেরে দেখল সুবীরবাবু ডন বৈঠক দিচ্ছেন। যদিও দুবার করার পরেই তিন মিনিট করে বিশ্রাম।

১৬

ডিনার পার্টি থেকে বেরিয়ে রবিন গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ অফিস নাম্বার থেকে ফোন। রবিন আমেরিকার সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স।

লিমুজিনে উঠে বসে ফোনটা ধরল রবিন।

—বলো শেরী। এত রাতে! জরুরি কোনও দরকার আছে?

—খুব ভালো হয় যদি আপনি একবার অফিসে চলে আসেন—একটা জরুরি খবর আছে। বলব?

—আমি গাড়িতে আছি। বলতে পারো।

—ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টার থেকে IRVE-12 স্পেসক্র্যাফট ছাড়ার কথা ছিল। ওটা সাকসেসফুলি লঞ্চ হয়েছে।

এই কথা শোনানোর জন্য জরুরি ফোন? প্রতিমাসে এরকম পাঁচটা ভেহিকল ছাড়া হয়। আর সাম্প্রতিককালে লঞ্চ ফেলিওর হয়েছে এরকম ঘটনাও খুব কম। তবু প্রচণ্ড বিরক্তিটা কথায় প্রকাশ না করে রবিন বলে ওঠেন,—পরমাণু বোমা-টোমা লাগানো নেই তো?

—না, না, সেরকম কিছু নয়। এটা হল ইনফ্ল্যাটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল এক্সপেরিমেন্টের অংশ। অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি এতে করে মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে। ম্যাক 20 স্পিডে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পরও পুড়ে যায় না, গরম হয় না।

একে তো প্রচুর ওয়াইন পার্টিতে খাওয়া হয়ে গেছে—তারপর এসব জটিল জটিল শব্দ—মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল রবিনের। বললেন,—তা খুব ভালো। কিন্তু অসুবিধেটা কোথায়?

—এটা ছ'মাস পরে লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল। আজকে লঞ্চ হয়ে গেছে। সাকসেসফুল যদিও।

—বাহ, খুব ভালো খবর। মিশনের সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, নামগুলো কাল পাঠিয়ে দিও। আর কিছু?

—এ মিশনটা নাসার কন্ট্রোলে ছিল না।

—মানে? ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টার তো নাসারই আন্ডারে। কী বলছ?

—চারদিন আগে দুজন ছেলে রিসার্চ সেন্টার অ্যাটাক করে এ মিশনের পুরো কন্ট্রোল নিয়ে নিয়েছিল।

—দুজন? নাসার মতো সিকিউরিটি ভেঙে! বলো কি!

—হ্যাঁ, সেজন্যই তো ফোন করছি। আপনি যদি অফিসে আসেন—! ইনফ্যাক্ট বাকি যে কাজ ছিল তা ওরা দুজনে দুদিনেই শেষ করে দেয়। পুরো প্রোগ্রামের কন্ট্রোল নিয়ে নেয়। সেন্টারের ম্যানেজমেন্টের সিনিয়ার লোকেদের হোস্টেজ করে নেয়। একটা আলাদা বিল্ডিং-এ বন্দি করে রাখে।

—ওরা কতজন ছিল যেন?

—দুজন। আগেই তো বললাম।

—বলো কী! শুধু দুজনে? ওখানকার সিকিউরিটি কি করছিল? ঘুমোচ্ছিল? কতজন সিকিউরিটি ছিল ওখানে?

—দু-হাজার চারশো। আমাদের দেশের সেরা সিকিউরিটি। নাসার সিনিয়ার ম্যানেজমেন্টকে হোস্টেজ করার সময় ওদের সঙ্গে ছেলেদুটোর সংঘর্ষ হয়। চল্লিশ জন আহত হয়েছে। দুজন মারা গেছে।

—বলো কী! এজন্যই অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ মাঝেমধ্যে দরকার। বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে সিকিউরিটিগুলো নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। যে-ক'টা বেঁচে আছে সবক'টাকে ডিসমিস করব।

—ছেলেদুটো নাকি খুব সাধারণ ছিল না। অ্যালিয়েনও হতে পারে।

—কেন অ্যালিয়েন হবে কেন? চারটে মাথা, আটটা পা ছিল নাকি? কীরকম দেখতে ছিল?

—না, না, সেরকম কিছু নয়। একদম আমাদের মতো, খুব সুন্দর দেখতে। নীল চোখ, ঝাঁকড়া সোনালি চুল। নাক-মুখ শার্প। দেখলেই গ্রিক দেবতাদের কথা মনে পড়ে যায়।

—তুমি কাদের দলে শেরী? ওদের দলে নয় তো? এত প্রশংসা করছ! মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। নীল চোখ হোক, লাল চোখ হোক, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার প্রশ্ন, দুজন মিলে এত হাই সিকিউরিটি এরিয়াতে ঢুকে এতগুলো লোককে ভেড়া বানিয়ে কন্ট্রোলটা নিল কী করে?

—ছেলে দুটো নাকি চিতাবাঘের থেকেও জোরে দৌড়োয়। গায়ে অমানুষিক জোর। যে দুজন সিকিউরিটি মারা গেছে, তাদের একজন তো মারা গেছে স্রেফ একটা ঘুষি খেয়ে। যে-কোনও কিছু বেয়ে বাঁদরের মতো উঠে যেতে পারে ওরা।

—তা তারা আছে কোথায় এখন? চিড়িয়াখানায়? আর এত যে কথা বলছ,—ওদের স্পোকস-পার্সন হয়ে যাওনি তো?

—না, না স্যার। ওরা চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে যে এটা নাকি ওদের টেস্ট ছিল। রেজাল্ট অবশ্য জানে না। ফেল করলে আবার এরকম কোনও একটা হাই সিকিউরিটি সেন্টারের কন্ট্রোল নিতে হবে।

—বলো কী? এরকম কোনও টেররিজমের কোর্স কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে না তো! তা নাসার কর্তা-ব্যক্তিরা করছেনটা কী? আমাকে কনফারেন্স করো তো ওখানকার ডিরেক্টারের সঙ্গে।

—না, উনি এখন কথা বলবেন না।

—কেন? অভিমান করেছেন না কি?

—না স্যার, ওদের মধ্যে একটা ছেলে যাওয়ার সময় ওনার গোঁফটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। বলেছে প্রুফ দিতে হবে।

—মাই গড!

—ভাবুন! অত সাধের গোঁফ ড: ফ্রেডরিক পাফের। তারপর থেকে কথাই বলছেন না।

ফোনটা ছেড়ে গাড়ি থেকেই আরেকটা ফোন করলেন রবিন। CIA-র ডিরেক্টর রবার্টকে।

—রবার্ট, তুমি সেদিন কি একটা প্রোজেক্টের কথা বলছিলে না? ইনহিউম্যান লোক তৈরির। কী নাম যেন—প্রোজেক্ট এইচ।

—ইনহিউম্যান নয়, সুপার হিউম্যান বা অতিমানব তৈরির প্রোজেক্ট। অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক তৈরির।

—কী স্ট্যাটাসে ছিল যেন প্রোজেক্টটা?

—শুনেছিলাম শেষের দিকে। ফাইনাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

—কে দেখছে প্রোজেক্টটা?

—সেটাই তো জানি না। সেজন্যই তো ফোন করেছিলাম আপনাকে। আপনার কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়।

—শোনো, একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার ধারণা ওটা এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। আমি আধঘণ্টা পরে ভিডিয়ো কনফারেন্স রাখছি। ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সির হেড ড: কেভিনকেও ডেকে নিচ্ছি। এই প্রোজেক্টটা আমাদের ইমিডিয়েটলি বন্ধ করার দরকার। জানা দরকার যে কে আসলে এটা নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা তিনজনেই যদি না জানি, তাহলে আর কে জানবে? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?

১৭

লাস ভেগাস আর নাসার ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টারের ঘটনা দুটোর ভিডিয়ো ফুটেজ বেশ কয়েকবার দেখলেন রবিন। সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স রবিনের সন্দেহ নেই যে দুটোই সাধারণ মানুষের কাজ নয়। বিদ্যুৎবেগে এরা যাতায়াত করে। খালি হাতে কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। নির্ভুল লক্ষ্যে পরের পর গুলি চালিয়ে যেতে পারে। এক লাফে পঞ্চাশ ফুট পেরিয়ে যায়। খুব চটপট ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে।

ওনার সঙ্গে আজ মিটিং-এ আছেন সিআইএ-র ডিরেক্টর রবার্ট।

—তা আপনার কাছে যা খবর তাতে এসব পরীক্ষা চলছে প্রোজেক্ট এইচ-এর অংশ হিসেবে?

—হ্যাঁ, শুধু এই নয়, কয়েকদিন আগে আমেরিকায় যে পাওয়ার গ্রিড ফেলিওর হয়েছিল, সেটাও নাকি ওরাই ঘটিয়েছিল।

—সেকী? সেবার তো পুরো আমেরিকা পাঁচ ঘণ্টার জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। নাহ, এদের এগেনস্টে স্টেপ নিতেই হচ্ছে। তা এসব করে এদের লাভ?

—দেখাতে চায় যে এরাই সেরা মানবজাতি। কুড়িজনেই সারা পৃথিবী দখল করার ক্ষমতা রাখে।

—বলো কী?

—শুধু তাই? আমি তো এ-ও খবর পেয়েছি—আপনাকে নাকি কিডন্যাপ করার প্ল্যান আছে।

—সর্বনাশ! মেরে-টেরে ফেলবে নাকি?

—নাহ, সেটা অবশ্য জানায়নি। বেঁচে থাকতেও পারেন। তবে এদের কাছে প্রাণের তো বিশেষ দাম নেই। যারা টেস্ট দিতে গিয়ে কয়েকজনকে মেরে ফেলে, তারা পরীক্ষা পাশের পরে কতজনকে মারবে কে জানে!

এই এসি-র ঠান্ডাতেও রবিন রীতিমতো ঘামতে শুরু করলেন।

—তা এই 'প্রোজেক্ট এইচ' চালাচ্ছেটা কে?

—আমি খবর পেয়েছি ড: কোলিন বলে একজন। আর্মিতে ছিলেন একসময়। প্রোজেক্টের গোপনীয়তার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা ওনার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

—ওনাকে জানিয়ে দিন এ প্রোজেক্ট বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে।

—আর যে সব অতিমানবদের অলরেডি সৃষ্টি করা হয়েছে?

—অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে।...ওহ, সেদিন এসি চলেনি বলে আমার কুকুরটার যে কী কষ্টই না হয়েছিল! এখনই কোলিনকে ফোন করুন।

—ব্যাপারটা অত সহজে হবে না। মনে রাখবেন এরা প্রত্যেকেই খুব স্পেশাল ক্ষমতা রাখে। অতজন সিকিউরিটি মিলে দুজনকে সামলাতে পারেনি। দেখতে হবে যাতে ওরা কেউ টের না পায়। আমি এমনও শুনেছি যে ওরা সবাই ওদের ওখানে একজনের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা শোনে না। এমনকী ড: কোলিনেরও নয়।

—কেন? এমন কেন?

—আসলে আর্মির জন্য তৈরি তো। তা না হলে ওদের মধ্যে ডিসিপ্লিন বোধ আনা যেত না। যে যার ইচ্ছেমতো চললে তো সর্বনাশ। এরা সবাই একজনেরই নির্দেশ শোনে।

—হু বুঝলাম। তা তার সঙ্গেও কথা বলো তাহলে। মোদ্দা কথা এ প্রোজেক্ট ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে হবে। আমাকে কিডন্যাপ—কী সর্বনেশে কথা!

১৮

কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না ড: কেন। একটা সময়ে উনি এ প্রোজেক্টে অংশগ্রহণ করতে চাননি। চাননি অতিমানব তৈরি করতে। উনি জানতেন এর বিপদ। একবার তৈরি করার পর এদের নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। কারণ এরা বুদ্ধির দিক থেকেও সাধারণ মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে। বলার আগেই বুঝে যায়।



কিন্তু উপায় ছিল না। ওনার বিরুদ্ধে টেররিজমের চার্জ আনা হয়েছিল। তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এই প্রোজেক্টের চিফ সায়েন্টিস্ট হওয়া। সবাই জানত যে জিন নিয়ে ছেলেখেলা যদি কেউ করতে পারে—সে একজনই, ড: কেন। কীভাবে মানুষের জিনের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্পেশাল ক্ষমতা দেওয়া যায় সে প্রযুক্তি শুধু ড: কেনেরই জানা ছিল। আর এটাই সর্বনাশ ডেকে আনল। ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। আর এই ষড়যন্ত্রের জাল পাতল কে? আর কেউ নয়, স্বয়ং গভর্নমেন্ট। যে সে গভর্নমেন্টও নয়, সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট। এ ধরনের জাল থেকে চেষ্টা করলেও একজনের একার পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয়।

আর ভাগ্যের কী পরিহাস! আজ সেই গভর্নমেন্টই আদেশ দিয়েছে তার সব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে। এরা কি একটা মাটির পুতুল যে তৈরি করলাম আর ভেঙে দিলাম! এরা প্রত্যেকেই ড: কেনের সন্তানের মতো। এরা ড: কেনকেই এদের বাবা বলে জানে। এরা ছোটবেলায় ড: কেনের কাছে গল্প না শুনে ঘুমোতে যেত না। সকালে ড:

কেনের সঙ্গে বসে প্রার্থনাসঙ্গীত না গাইলে এদের ভোর শুরু হত না। এরাই বিস্ফারিত চোখে, মুখে খাবার নিয়ে বসে থাকত, আর ড: কেনের তাসের ম্যাজিক দেখত। এদের কারও জ্বর হলে ড: কেনই মাঝরাতে বারবার এসে কপালে হাত দিতেন। রাত জেগে বসে থাকতেন। আর এদেরকেই মেরে ফেলতে হবে?

প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর ড: কোলিন খানিক আগেই ওপরতলার আদেশ শুনিয়েছেন। উনি প্রতিরোধের যাবতীয় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আদেশের কোনও নড়চড় হয়নি। আজকের মধ্যেই এ কাজ সারতে হবে। এ ল্যাবও বন্ধ করে দিতে হবে।

ঝাপসা চোখে বিল্ডিংটা একবার শেষবারের মতো পর্যবেক্ষণে বেরোলেন ড: কেন। চারতলা। বেসমেন্টে নানান ধরনের জন্তু রাখা। চিতাবাঘ থেকে গিরগিটি। ইঁদুর থেকে র‍্যাটল স্নেক। এদের থেকে ডিএনএ নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। এদের ওপরেও অনেক টেস্ট হয়। এর পাশেই বিশাল অপারেশান থিয়েটার। বিশাল স্টেনলেস স্টিলের ফার্মেন্টর, সাইক্লোট্রন—জিন পরিবর্তনে যে রেডিয়ো অ্যাকটিভ কণা লাগে তার জন্য।

একতলায় NMR স্ক্যানার। PET স্ক্যানার। অত্যাধুনিক মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাব। ড: কেনের নিজের হাতে খুব যত্নে তৈরি করা। দোতলায় বিশাল ল্যাবরেটরি—এখানেই জিনের গঠন পালটানোর নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। তিনতলায় লাইব্রেরি। সার দিয়ে কম্পিউটার রাখা আছে। অফিস এরিয়া। বিশাল অডিটোরিয়াম।

ধীরপায়ে পুরো অফিসটা ঘুরে ড: কেন অডিটোরিয়ামে ঢুকলেন। ওনার তৈরি সব অতিমানবকে উনি অডিটোরিয়ামে আসতে বলেছেন দু-ঘণ্টা বাদে। এখন অবধি কেউ কিছু জানে না। আর দু-ঘণ্টা বাদে এই অডিটোরিয়ামই হবে ওদের বধ্যভূমি। ওদের প্রত্যেককে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। কৃত্রিমভাবে তৈরি ক্ষতিকারক ভাইরাসের ডিএনএ এদের ক্রোমোজোমে মিশে যাবে। তারপর আর কতক্ষণ?

মুখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকার অডিটোরিয়ামের প্রথম সারিতে বসে গেলেন ড: কেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এদের কী বলবেন? 'তোমাদের জীবন আমিই দিয়েছি, আজকে সে জীবন আমিই আবার কেড়ে নেব।'

তিলতিল করে যত্নে গড়ে তোলা এই প্রাণগুলোকে কালকের ভোর কোনওভাবেই দেখতে দেওয়া যাবে না। আর ওরা? ড: কেন জানেন যে ওরা এর কোনও প্রতিবাদ করবে না। ওদের কাছে একটাই পৃথিবী—একটাই সূর্য—একটাই ঈশ্বর—একজনই শেষ কথা—তিনি হলেন ড: কেন। সেরা সৈনিকদের মতো হাসিমুখে মৃত্যুও মেনে নেবে আদেশ পেলে।

কতক্ষণ এভাবে কাঁদছিলেন কে জানে? বাইরের বন্ধ দরজায় টোকা পড়ছে। ল্যাবের টিম ইঞ্জেকশন রেডি করে এসে গেছে। প্রথম সারির চেয়ার থেকে দরজার দিকে হেঁটে এগিয়ে গেলেন ড: কেন। মাঝের কুড়ি ফুটকে ওনার মনে হল যেন কুড়ি বছর পেছনে হাঁটা।

স্পষ্ট কানে ভাসছে অনেকগুলো বাচ্চার কান্না। প্রথম ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওদের ছোট ছোট শরীরে, হাতে-পায়ে। আর তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন উনি। না, এরা তো শুধু নিজের সৃষ্টি নয়—কোনও এক্সপ্রেরিমেন্টের ফসল নয়—এরা তো ড: কেনেরই সন্তান। মনে মনে ড: কেন তখনই স্থির করেছিলেন সুখে-দু:খে সবসময় এদের সঙ্গে থাকবেন উনি। বাবা-মা'র আরও নানান পরিচয়ের শূন্যস্থানগুলো একাই পূরণ করবেন উনি। আর আজকে? আজকে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে—খুনি হতে হবে। ওরা যখন ছটফট করবে যন্ত্রণায়, তখনও মনকে বোঝাতে হবে—যা এতদিন ভেবেছি সব মিথ্যা—সব অহেতুক প্রশ্রয়। এরা সন্তান নয়—কেউ নয়। বিজ্ঞানীর জীবনে সত্য শুধু একটাই—বিজ্ঞান।

১৯

—স্যার, ওরা সব অডিটোরিয়ামে এসে বসেছে। আমাদের মেডিকাল টিমও রেডি। আপনি কি একবার ওদের সঙ্গে কথা বলবেন? শেষবার?

'শেষবার'—কথাটা খুব কানে লাগল ড: কেনের। 'না'—বিরক্ত হয়ে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ড: কেন। তারপর কি ভেবে আবার উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন—'চলো।'

খানিক আগে অডিটোরিয়াম ছেড়ে চলে এসেছিলেন। মেডিকাল টিমের প্রস্তুতি—একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এসে বসেছিলেন ওনার চেম্বারে—তখন ওদের কেউ ছিল না।

ধীরপায়ে ড: কেন এগিয়ে চললেন অডিটোরিয়ামের দিকে। সঙ্গে জুনিয়র সায়েন্টিস্ট ডক্টর রজার। ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই পরিচিত সমবেত কণ্ঠ—'গুড মর্নিং ডক্টর কেন।' অন্যদিনের মতো একইভাবে ফিরতি 'গুডমর্নিং'—বলতে গিয়ে আওয়াজ বেরোল না ড: কেনের। ডায়াসের ওপর উঠে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—

—আমি সরাসরি আসল কথায় চলে আসি। তোমরা হয়তো আগেই খানিকটা আন্দাজ পেয়েছ। হ্যাঁ—আজকেই তোমাদের শেষ দিন। খানিকক্ষণের মধ্যেই তোমাদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে। আর তার দশমিনিটের মধ্যেই তোমাদের মৃত্যু হবে। যন্ত্রণা খুব একটা হবে না—হলেও তা সহ্য করার শক্তি তোমাদের আছে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় তোমরা মেডিকাল টিমের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করো। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

পুরো অডিটোরিয়ামে পিন ড্রপ সাইলেন্স। একেই বলে ট্রেনিং। একেই বলে শৃঙ্খলাবোধ। এদের কি আর কষ্ট হচ্ছে না! এ জীবনের প্রলোভন কাটানো বড় শক্ত। সেই আবেগ-অনুভূতিকে সহ্য করার ট্রেনিং পেয়েছে এরা! কিন্তু ডক্টর কেন তো আর এদের মতো ট্রেনিং নেওয়া সেনা নন। তাই এই নীরবতা ওনার সহ্য হল না। উনি ফের বলে উঠলেন,—আমি তোমাদের খুব ভালোবাসি। তোমরাই ছিলে আমার সবথেকে আপনার। তোমাদের প্রত্যেককে আমি আমার সন্তানের মতো দেখেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই আমার আদেশ। আরেকবার জিগ্যেস করছি—কারও কোনও প্রশ্ন আছে? ধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

একটা হাত উঠেছে। কোলিন। ডক্টর কেন সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসার চেষ্টা করলেও, যাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসতেন, তাদের মধ্যে কোলিন একজন। খুব শান্ত-বাধ্য ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায় মাঝেমধ্যেই পালিয়ে ডক্টর কেনের ঘরে চলে আসত। আর ডক্টর কেনের গা ঘেঁষে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডক্টর কেন কি করেন তা লক্ষ্য করত। হাজারো প্রশ্ন করত। কখনও-বা রাতে ভয় পেয়ে ডক্টর কেনের চাদরের মধ্যে ঢুকে ডক্টর কেনকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

—ডক্টর কেন—আপনি যে বলতেন আমাদের জীবন খুব মূল্যবান। আমরা কখনও যেন তা অহেতুক নষ্ট না করি! কিন্তু আজ হঠাৎ করে আমাদের মৃত্যুর আদেশ। খানিকক্ষণ থেমে কোলিন ফের বলে উঠল—

আমরা কি একসপ্তাহ সময় পেতে পারি?

না কোলিন—আজকেই—পরের একঘণ্টার মধ্যে এ বিল্ডিং-এর সব আলো নিভে যাবে। তোমাদের তৈরিই করা হয়েছিল যুদ্ধের সেনা হিসেবে। সেনাদের তো মৃত্যু যখন-তখনই আসে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। একটু থেমে ড: কেন ফের বলে উঠলেন,—আমায় তোমরা পারলে ক্ষমা করো।

তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘাড় ঘোরালে দেখতে পেতেন ঘরের সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে উঠেছে তাদের প্রিয় দেবতাকে শেষবারের মতো সম্মান জানাতে।

২০

পিকুর ঘুম খুবই পাতলা। তাই দরজায় একটা টোকাতেই ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। তিন ঘণ্টা হল ঘুমিয়েছে। দরজায় সুবীরবাবু ড্রেসিংগাউন পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে চিন্তার ছাপ।

—কী ব্যাপার কাকু? এত সকালে?

—আমার বাগানে কীসের আওয়াজ পেলাম। উঠে বেরোতে যাব, দেখি ফোনে মেসেজ এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল পিকু,—'লিভ অ্যান আর্বার ইমিডিয়েটলি।'

সুবীরবাবু বললেন,—তোমার জন্য মেসেজ বুঝতেই পারছ। কেউ তোমার এখানে থাকা পছন্দ করছে না। এক্ষুনি অ্যান আর্বার ছাড়তে বলছে।

—কাকু, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে এখনই বেরিয়ে যাব। আমার জন্য আপনিও বড় বিপদে পড়েছেন, আমিই এরজন্য দায়ী।

সুবীরবাবু এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন পিকুকে।

—আমার যদি তোমার মতো ছেলে হত, আমি নিজেকে সত্যি ভাগ্যবান মনে করতাম পিকু। আমার বিশ্বাস আসল সত্যের সন্ধান তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাবে। সেটা ভালো বা খারাপ যেটাই হোক। আর আমার বিপদ নিয়ে একদম ভাববে না। গত পনেরো বছর ধরে আমার জীবন কীরকম জানো তো? কোনও বৈচিত্র্য নেই, কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। কথা বলার কোনও লোক নেই। অনেকসময় জীবন এত বিবর্ণ হয়ে যায় যে থাকা আর না থাকা একই ব্যাপার।

এই যে তোমার সঙ্গে এতদিন বাদে কথা বলতে পারছি, মনে হচ্ছে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

একটু থেমে সুবীরবাবু আবার বললেন,—আমার ব্যাপারে ভয় পেয়ো না। আমার গায়ে কিন্তু অসম্ভব জোর। একবার এখানে দশটা গুন্ডাকে একা পিটিয়েছিলাম।

পিকুকে হাসতে দেখে সুবীরবাবু যেতে যেতে বললেন,—আহা! মারপিটের সময় কি আর কেউ কাউন্ট করে দেখে কজন আছে! তবে একাধিক লোক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি এবার একটু বাইরের আওয়াজের ব্যাপারটা দেখে আসি। কীরকম একটা অস্বাভাবিক পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছিলাম।

—দাঁড়ান কাকু, আমিও যাচ্ছি।

—চলো!

পোশাক পরে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশ একটু লালচে হতে শুরু করেছে। পাশের কোনও একটা গাছের থেকে কাঠঠোকরার ঠুকঠুক আওয়াজ আসছে। বাতাসে এখন শীতের আমেজ। পাতলা চাদরে গা ঢাকা দেওয়ার মতো ঠান্ডা। সুবীরবাবুর বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রথমেই ওরা গেটের দিকে এগিয়ে গেল বাড়িতে ঢোকার রাস্তা দিয়ে, সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। ঘাসের লন পেরিয়ে দূরের পুকুরের

দিকটাও ঘুরে দেখে এল। নাহ, কিছুই নেই! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সারি সারি ম্যাপল গাছ। ওখান দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পিকু।

—ওটা কী?

ছুটে কাছে গেল ওরা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন। মুখটা একপাশে ঘোরানো। গায়ের সবুজ শার্টে স্পষ্ট রক্তের ছোপ। গায়ের রংও অদ্ভুত সবুজ। তাই ঘাস ঝোপে সত্যিই চট করে চোখে পড়ে না। কেউ পিছন থেকে গুলি করেছে। লোকটার বাঁ-হাতে একটা রিভলভার।

—চিনতে পেরেছেন? পিকু জিগ্যেস করল।

বিস্ময়ে বিমূঢ় সুবীরবাবু বলে উঠলেন,—না, ভালো করে মুখটা দেখা যাচ্ছে না তো! কে বলো তো? এরকম সবুজ রং কারো হয় না দেখলে বিশ্বাস হত না!

—সেদিন যে ছেলেটা চেস টুর্নামেন্টে জিতল, সেই ছেলেটা।

—বলো কী? ওই ভালো স্টুডেন্ট? শিওর? রংটা ওরকম সবুজ হল কী করে?

—কে জানে? তবে এটা যে ওই ছেলেটাই তাতে সন্দেহ নেই। গায়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আপনি 911 ডায়াল করুন। পুলিশ এসে দেখুক।

সুবীরবাবু ফোন করার খানিকক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল ছেলেটাকে। তবে তখনই চেক করে বলে দিলেন যে প্রাণ নেই। পুলিশের গায়ের রং দেখে মুখে কিছু না বললেও সবাই অবাক। সেই একই পুলিশের ডিটেকটিভ এসেছে সঙ্গে। ওদের দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠল,—পরশু রাতে জুলি জর্ডনের ওখানে দেখা হয়েছিল না? আপনারাই তো ডেকেছিলেন!

একটু থেমে ফের বলল,—ফরেন্সিক এক্সপার্ট আসবে এক্ষুনি। এ জায়গাটা সিল করে দেওয়া হবে। আপনারা বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোবেন না ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া অবধি। আচ্ছা, আপনারা কি ছেলেটাকে চিনতেন?

সম্মতি জানিয়ে পিকু মাথা নাড়ল,—পরশু ওপেন চেস টুর্নামেন্টে একসঙ্গে খেলেছিলাম। ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই সূত্রে পাঁচ মিনিটের আলাপ।

ডিটেকটিভ আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করল। এখানে আগে কখনও ছেলেটাকে দেখা গেছে কিনা, এখানে আসার কোনও কারণ থাকতে পারে কিনা—ইত্যাদি।

সব কথা শুনে রীতিমতো ভুরু কুঁচকে চলে গেল অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

সুবীরবাবু পাশ থেকে বললেন,—চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তা না বললেই পারতে। এখানকার পুলিশ অসম্ভব বোকা। কমনসেন্সের প্রচণ্ড অভাব। মনে মনে ভাবছে তুমি টুর্নামেন্ট হারার জন্য মার্ডার করেছ কিনা!

সুবীরবাবুর কথাই ঠিক। ডিটেকটিভ আবার ফিরে এসে খুব গম্ভীরভাবে পিকুকে জিগ্যেস করল,—খেলার শেষে তোমাদের মধ্যে কি মারপিট বা ঝগড়া হয়েছিল?

পিকু হেসে বলল,—না, না। আমরা চেস খেলছিলাম, আমেরিকান ফুটবল বা রাগবি নয়।

ডিটেকটিভ কী বুঝল কে জানে? এবার পুরো দলবল নিয়ে চলে গেল আশেপাশে খোঁজ নিতে—কেউ কোনও সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা। গেটের কাছে একজনকে আর ক্রাইমের জায়গাটায় আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে চলে গেল।

এরমধ্যে সুবীরবাবুর ফোন বেজে উঠল। সাইমনের ফোন। সেই মিসিগান ল'স্কুলের লাইব্রেরিয়ান—যার সঙ্গে চেস টুর্নামেন্টের দিন দেখা হয়েছিল, যিনি পিকুকে জড়িয়ে ধরে তিনমিনিট কেঁদেছিলেন।

—একবার গেটে আসবেন? আপনার গেটে যে গাধাটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

—আরে আপনি! আমি এক্ষুনি আসছি।

গেটের কাছে ভদ্রলোকের সাদা মার্সেডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উনি ড্রাইভারের সিটে বসে হাত নাড়ছেন। সুবীরবাবু বলার পর রোবট পুলিশ সাইমনকে ঢুকতে দিল। গাড়ি সোজা গ্যারেজে ঢুকিয়ে ভদ্রলোক গাড়ি

থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুবীরবাবুর কৌতূহলী মুখের দিকে তাকিয়ে গ্যারেজ থেকে বাড়িতে ঢোকার দরজা দেখিয়ে বলে উঠলেন, —সব জানি। ভেতরে ঢুকে বলছি।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলে উঠলেন,—পিকু, তুমি দু-মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে বেরিয়ে যাও। তোমার খুব বড় বিপদ। রাস্তায় কুড়ি ফুট অন্তর ক্যামেরা রাখা আছে। পুলিশ ওইসব ক্যামেরার ছবি চেক করছে। এ রাস্তা দিয়ে গত তিনঘণ্টায় যত গাড়ি গেছে, সব গাড়ি ও গাড়ির ভেতরের লোকেদের ছবি—ওই সব ক্যামেরায় তোলা আছে। এই সময় এমনিতেও খুব কম গাড়ি যায়, তাই খুঁটিয়ে দেখছে ওরা।

—তাতে কী?

—তাতে পিকুর ছবি আছে।

—মানে? সে তো আমরা পরশু মাঝরাতে একটা জায়গা থেকে ফিরছিলাম বলে। আমিও তো ছিলাম গাড়িতে। সুবীরবাবু বললেন।

—তা নয়। ঠিক পিকুরই মতো দেখতে আরেকজন আছে। তার ছবিই ধরা পড়েছে ক্যামেরাতে। তার হাতেই খুন হয়েছে ওই ছেলেটা। যে মারা গেছে তার নাম ড্যানিয়েল। পরশু দিনই আমি আপনাদেরকে ড্যানিয়েল সম্পর্কে বলতাম। ও কাছাকাছি ছিল বলে বলিনি। ড্যানিয়েল ঠিক সাধারণ মানুষ ছিল না, ও ছিল অনেক স্পেশাল ক্ষমতার অধিকারী। ও আর ওর বন্ধু থাকত আমার পাশের বাড়িতে। তাই আমি ওদের দুজনের সম্পর্কেই খানিকটা জানতাম।

একটু থেমে পিকুর দিকে তাকিয়ে সাইমন বলে উঠলেন,—আমি সেদিন শুধু শুধু অতটা কাঁদিনি। তোমার বাবা ছিলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও মিসিগান মেডিক্যাল স্কুলে বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স রিসার্চ বিল্ডিং-এ রিসার্চ করত। আমরা প্রায়ই বসে দাবা খেলতাম। আগে আমি বলিনি, কারণ ড্যানিয়েল অনেক দূর থেকেও সব কথা শুনতে পায়। দেখতে পায়। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ও তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ করছিল। ওর দৃষ্টিতে তোমার ওপর একটা আক্রোশ ছিল—সেটা আমার চোখ এড়ায়নি।

—দুদিন আগে আমি জুলি জর্ডনের বাড়ি গিয়েছিলাম, ওখানে ওকেই আমি দেখেছিলাম, আমার মনে হয় ও আমাকে দেখেছিল। পিকু ফের বলে, পরশুদিন ও আমার অ্যাড্রেস-ও নিয়েছিল।

—হ্যাঁ, তাই হবে। জুলিকে আমিও চিনতাম, কারণ ওর হাজব্যান্ড ডেভের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কাল মাঝরাতে ড্যানিয়েলকে আমি বেরোতে দেখি। ওর হাতের বন্দুকটা আমার চোখে পড়েছিল। কেন জানি না, তোমার কথাই মনে হয়েছিল। একটু দূরে দূরে থেকে ফলো করছিলাম। গাড়িটা একটু দূরে রেখে তোমাদের পিছন দিকে যে বাড়িটা আছে, দেখলাম, তার মধ্যে দিয়ে তোমাদের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। ঠিক এর মধ্যে আরেকজনকে দেখলাম ওর পিছু নিতে। অন্ধকারে তাকে আমি অবশ্য ভালো করে দেখতে পাইনি।

ঠিক করলাম ওখানেই অপেক্ষা করব। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। হঠাৎ একটা আওয়াজ পেলাম তোমাদের বাগানের দিক থেকে। যাব কি যাব না ভাবছি, দেখলাম পিকু তোমাদের পেছনের বাড়ির বাগান থেকে জোরে হেঁটে বেরিয়ে আসছে।

আমি স্বাভাবিক ভাবেই ওর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেটা বলে উঠল, আমি পিকু নই, পিকুকে এক্ষুনি অ্যান আর্বার ছেড়ে চলে যেতে বলুন।

বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল। একটা গাড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, 'আমি ওর জন্য এখানেই অপেক্ষা করছি। ওর বড় বিপদ।'

এটা আধঘণ্টা আগের কথা। পুলিশ এসে যাওয়ায় আমি আগে বলতে পারিনি।

—কিন্তু কোথা দিয়ে বেরোব? গেটে তো পুলিশ আছে।

—আরে সে তো সামনের গেটে। তুমি এই পেছনের বাগান পেরিয়ে পেছনের বাড়ির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাও।

—কিন্তু ছেলেটা কে?

—ছেলেটা তোমার যমজ ভাই। তুমি নিশ্চিন্তে ওরসঙ্গে যেতে পারো। ও তোমাকে বাঁচাতেই এসেছে, জয়ন্ত আমার খুব বন্ধু ছিল বলেই ব্যাপারটা জানি। শান্তনু, অর্থাৎ তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর ওর ডিএনএ দিয়ে দুজন যমজ সন্তানের পরিকল্পনা করেছিল জয়ন্ত। একজন হলে তুমি। অন্যজন নির্ঘাত ওই ছেলেটা। যাও পিকু, আর একমুহূর্তও দেরি কোরো না।

পিকু ব্যাগ নিয়ে পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সাইমনের কথামতো বাড়ির পিছন দিক দিয়ে অন্য বাড়ির বাগান পেরিয়ে পিছনের রাস্তায় গিয়ে নামল। বাইরে এখন ভালো আলো। সূর্যোদয় হয়ে গেছে। একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দরজা খুলে গেল।

পিকু ওঠামাত্র গাড়িতে বসে থাকা লোকটা গাড়ি স্টার্ট দিল। ওর মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল পিকু। এ যেন নিজেকেই আয়নায় দেখছে। গাড়ি চালাতে চালাতেই ছেলেটা বলে উঠল,—দেখতে এক হলে কী হবে, আমার নামটা কিন্তু একদম অন্যরকম। ব্রায়ান। চট করে কয়েকটা দরকারি কথা বলে নিই। সাইমনের হাতে একটা খাম পাঠিয়েছিলাম। ওর মধ্যে একটা প্লেনের টিকিট আছে। আর পাম স্প্রিং-এর একটা ঠিকানা আছে। ওই ঠিকানায় কাল সকাল ছ'টায় আমরা মিট করব। তুমি যে প্রশ্নের খোঁজে এসেছ, সে প্রশ্নের উত্তর ওখানেই পাবে।

একটু থেমে ব্রায়ান একবার সাইড মিররে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—যা ভয় পেয়েছিলাম তাই—দেরি হয়ে গেছে। ফলো করছে।

—কে পুলিশ?

—না, না, পুলিশ হলে তো সোজা ছিল। এ হল ড্যানিয়েলের বন্ধু। খুব বিপজ্জনক। ও তিন মিটার অব্দি হাইজাম্প দিতে পারে। আট সেকেন্ডে একশো মিটার ছুটতে পারে। তা, তুমি কি গাড়ি চালাতে জানো?

—কেন?

—তুমি চালাও। আমি ওকে গুলি চালিয়ে থামানোর চেষ্টা করি।

—কিন্তু আমার যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এখানকার।

জোরে হেসে উঠল ব্রায়ান,—আগে তো প্রাণ বাঁচাও, তারপরে নিয়ম।

গাড়ি চালু অবস্থাতেই ড্রাইভিং সিটে কোনওরকমে চলে এল পিকু। বলল,—কোনদিকে এয়ারপোর্ট?

—আরে যে-কোনওদিকে যাও। স্পিডটা শুধু দেড়শোর কম কোরো না, আর পুলিশের গাড়ি দেখলেও দাঁড়িও না।

পিকু আগে গাড়ি চালিয়েছে, কিন্তু ভারতে আর আমেরিকাতে চালানোর মধ্যে অনেক তফাত। তবু এখন একটাই নিয়ম। ধাক্কা বাঁচিয়ে ম্যাক্সিমাম স্পিড। করলও তাই। ট্রাফিক কাটিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাতে লাগল—ঠিক ভিডিয়ো গেমসের মতো। ওর রিফ্লেক্স এমনিতেও খুব ভালো।

জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে ব্রায়ান পিছনে তাড়া করে আসা গাড়িটাতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। পিছনের গাড়ির ড্রাইভারও বেশ ওস্তাদ। ডানদিক-বাঁদিক কাটিয়ে এমনভাবে চালাচ্ছে যে গুলি করা খুব শক্ত। আর এর মধ্যেই পিকুর গাড়ির খুব কাছে চলে এসেছে।

ব্রায়ানের হাত বেশ পাকা। খানিকবাদেই তাড়া করে আসা গাড়িটার ডান দিকের টায়ারে গুলি লাগল। গাড়িটা কাছে চলে এসেছিল। ওই ছেলেটাও গুলি চালাতে শুরু করেছে। কয়েকটা গুলি ব্রায়ানের গাড়িতে এসেও লেগেছে। ব্রায়ানও এখন ছেলেটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।

হঠাৎ ব্রায়ান চেঁচিয়ে বলে উঠল,—বুকে গুলি লেগেছে ছেলেটার। তবে তাতে ওর কিছু হবে কিনা বলা শক্ত। আমার গাড়ির কাচ বুলেট প্রুফ বলে বাঁচোয়া।

পিছনের গাড়িটা থেমে গেছে। ব্রায়ান চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়িও না। জোরে চালিয়ে যাও।

এয়ারপোর্টে পিকুকে ড্রপ করে ব্রায়ান বলল,—সাবধানে যেও। পাম স্প্রিংস-এ দেখা হবে। ড্যানিয়েলের বন্ধুকে আমি একটু সামলে আসি। ও জানে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। বেঁচে থাকতে কোনওভাবে সেটা ও হতে দেবে না। গুলি লেগেছে ঠিক, কিন্তু মরেছে কিনা তা দেখে আসি।

পিকু হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, ব্রায়ান বলল,—শিগগির ভেতরে ঢুকে যাও। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তোমার মতো সাধারণ নই। আমি লড়তে শিখেছি। ব্রায়ান জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।

২১

ডেট্রয়েট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে পাম স্প্রিংস মোটে আধঘণ্টার ফ্লাইট। মাঝে অবশ্য একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। পাম স্প্রিংস-এ ফ্লাইট থেকে বেরিয়েই পিকু দেখল এক্সিট গেটের পাশে ট্যাক্সি বুকিং বুথ। বোর্ডিং পাস স্ক্যান করে, কত সময় বাদে ট্যাক্সি লাগবে বললেই ঠিক সেই সময়ে ট্যাক্সি এসে যাবে। রাত আটটা বাজে। সাড়ে আটটায় ট্যাক্সি বুক করে লাগেজ নেওয়ার জন্য এগোল পিকু। লাগেজ নিয়ে বেরোতে বেরোতে আটটা কুড়ি। এয়ারপোর্টটা ছোট। মরুভূমির মধ্যে বানানো শহর। বিত্তবানদের থাকার জায়গা। গরমে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি ছোঁয়। এখন অবশ্য গরম তেমন পড়েনি। বিশেষ করে সন্ধেবেলা বলে বেশ হাওয়া বইছে। দূরে মরুভূমির মধ্যে মাথা উঁচু করা ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর সে পাহাড়ের সঙ্গে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লুকোচুরি খেলছে মেঘে ভাসা নীল আকাশ।

ঠিক সাড়ে আটটায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পিকুর সামনে। বুকিং-এর সময়ে যে ট্যাক্সি নাম্বারটা পেয়েছিল, সেই নাম্বারটা মিলিয়ে ট্যাক্সির পিছনে লাগেজ রেখে ভেতরে উঠে বসল। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু উদ্ধতই হবে, কারণ লাগেজ গাড়িতে তোলার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করল না।

পিকুকে ব্রায়ান যে খামটা দিয়েছিল, তার মধ্যে এয়ার টিকিট ছাড়াও হোটেল বুকিং আর আগামীকাল কোথায়, ক'টায় দেখা করবে তার ডিটেলস ছিল। সেই হোটেলের অ্যাড্রেসই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিল পিকু। কোনও কথা না বলে অ্যাড্রেসটা নিয়ে লোকটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডে টাইপ করতে গাড়ি ছুটে চলল মরুভূমির বুক চিরে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে।

রাস্তার দু-ধারে কী আছে তা অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও এটুকু পিকু বুঝতে পারল যে আশেপাশে জনবসতি নেই। গাড়ির আলোতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা হল দু-ধারে প্রসারিত মরুভূমি আর ছোট ছোট ক্যাকটাস জাতীয় গাছ।

আধঘণ্টা বাদে হঠাৎ গাড়িটার স্পিড কমে গেল। কিছু কথা না বলে হঠাৎ গাড়িটা পাশের শোল্ডারে দাঁড় করিয়ে দিল ড্রাইভার। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল পিকুর দিকে।—পৌঁছে গেছি, নামতে পারো।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল পিকু। নীলচে চোখ, সোনালি ঝাঁকড়া চুল—অনেকটাই সেই চেস চ্যাম্পিয়ান ড্যানিয়েলের মতো দেখতে, মুখটা আরেকটু বেশি লম্বা। চোখের নীচটা বসা মতো।

—আমি ড্যানিয়েলের বন্ধু। বলে ডান হাতটা বিদ্যুৎবেগে বাড়িয়ে একহাতেই গলা টিপে ধরল পিকুর। দু-হাত দিয়ে ওই লোহার মতো শক্ত হাত প্রাণপণে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল পিকু। কিন্তু শক্ত লোহার মতো আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো গলার ওপরে চেপে বসেছে। ছটফট করতে লাগল পিকু। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। বুঝতে পারল মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

এরমধ্যে হঠাৎ কাচ ভাঙার শব্দ। কেউ পিকুর গলা থেকে ওই দৈত্যটার হাত টেনে সরিয়ে দিল, দৈত্যটার মুখে একটা জোরালো ঘুসি মারল। গাড়ির দরজাটা উপড়ে খুলে নিয়ে দৈত্যটাকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে নিল।

পিকু টের পেল এখুনি আসা লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারের প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়েছে। দুজনের কেউই কম যায় না। গাড়ি থেকে কোনওরকমে হাতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল পিকু। কিন্তু পারল না, ওখানেই বসে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান যখন ফিরে এল মুখের সামনে চাঁদের আলোয় এক চির পরিচিত মুখ। নিজেরই মুখ। অর্থাৎ এ আর কেউ নয়—ব্রায়ান। পিকুকে চোখ খুলতে দেখে ব্রায়ান বলল,—এখন কেমন লাগছে? ও হল ড্যানিয়েলের বন্ধু—যার কথা বলছিলাম। এখান অবধি কীভাবে জানি ফলো করে চলে এসেছিল। নির্ঘাত এই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মেরে ড্রাইভার সেজে উঠে বসেছিল। ইশ, তোমার কিছু হলে ড: কেনকে যে কী বলতাম!

আস্তে আস্তে বাইরের পৃথিবীর মায়াবী আলো ফিরে আসছে। চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তার আলোয় পিকু দেখল, ব্রায়ানের মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে। খানিকদূরে ড্যানিয়েলের বন্ধুর দেহ পড়ে আছে।

নাক-মুখের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ব্রায়ান বলে উঠল,—আমি ঠিক আছি। আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে যে কী হত! চলো গাড়িতে ওঠা যাক! আর ভয় নেই। আমি আছি তো!

বলে পিকুকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ির পিছনের সিটে সস্নেহে শুইয়ে দিল ব্রায়ান। গাড়ির একদিকের দরজার পাল্লাটা না থাকায় শুতে কোনওই অসুবিধে হল না পিকুর। টের পেল ব্রায়ান গাড়ি স্টার্ট করেছে।

২২

রাত দুটো। ডক্টর কেনের চোখে আজ ঘুম আসছে না। হঠাৎ সেলফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে খাটের পাশে রাখা ফোনটা ধরলেন কেন।

—ডক্টর কেন, আমি ব্রায়ান বলছি।

—হ্যাঁ, বলো। তুমি পাম স্প্রিং পৌঁছে গেছো তো?

—হ্যাঁ, আমি পাম স্প্রিং-এ।

—তা এত রাতে?

—আমি পিকুকে নিয়ে আসতে পেরেছি। একটু অসুবিধে হয়েছিল।

—কী?

—রজার পিকুকে আক্রমণ করেছিল। তাই রজারকে মারতে হয়েছে আমাকে।

—তাই?—দীর্ঘশ্বাস পড়ল ড: কেন-এর।—পিকু ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

—আর তুমি?

একটু যেন উৎসাহিত হল ব্রায়ান।—হ্যাঁ, আমার একটু লেগেছে, মাথায় আর মুখে। ও তেমন কিছু না। স্যার, যে জন্য ফোন করেছিলাম—একটু থামল ব্রায়ান।

—স্যার, আমাকে কি তৈরিই করা হয়েছে আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্য?

—হ্যাঁ, তা হঠাৎ এরকম প্রশ্ন?

—কেন? ও তো আমার মতোই। ওর জীবন তাহলে আমার থেকে বেশি দামি কেন?

ডক্টর কেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু বলে উঠলেন,—শুয়ে পড়ো ব্রায়ান। কাল কথা হবে। তোমাকে আমার সঙ্গে অনেক দূর যেতে হবে।

—আর পিকু?

—নাহ, ওকে নেব না। তুমিই থাকবে আমার সঙ্গে।

ব্রায়ান ভারি খুশি হয়ে 'শুভরাত্রি স্যার'—বলে ফোনটা রেখে দিল।

২৩

আজকের ভোরটা একদম অন্যরকম। সূর্য ওঠার আগেই যেন ভোর হয়ে গেছে। রাত কাটার আগেই যেন দিন শুরু। সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে পিকু। যন্ত্রণায় নয়, কৌতূহলে আর উত্তেজনায়। কার সঙ্গে কাল দেখা হতে চলেছে? ড: কেন—যার কথা ব্রায়ান একবার বলেছিল?

ড: কেন কি বাবার কথা জানতেন? পাম স্প্রিংস-এর মতো মরুভূমির মধ্যে এক জনহীন শহরে কী থাকতে পারে? সত্যিই কি সত্যের সন্ধান পেতে চলেছে পিকু? কুড়ি বছর আগে পিকুর জীবনের রূপ-রস-গন্ধ সবকিছু একমুহূর্তে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যে ঘটনা, সেই ঘটনাটার পিছনে আসলে কে ছিল? সেই খারাপ লোকগুলোর সঙ্গে কি মোলাকাত হবে এবার?

এসব ভাবতে-ভাবতেই রাত শেষ হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ভোরের ক্ষীণ আলো। ব্যর্থ ঘুমটাকে ফের ডেকে না এনে সাড়ে চারটে থেকেই রেডি হয়ে রয়েছে পিকু। কথামতো ঠিক সাড়ে পাঁচটাতে ব্রায়ান এসে হাজির। পিকু হোটেলের গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল।

গাড়িতে উঠে ব্রায়ানের দিকে তাকাল পিকু। সারা মুখে কালসিটে—কাটা দাগ। ড্যানিয়েলের বন্ধু যে খুব সহজে ছেড়ে দেয়নি তার প্রমাণ ব্রায়ানের শরীরের সর্বত্র। তবু তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ব্রায়ান বলে উঠল,—দুর্দান্ত ঘুম হল কাল। অত পরিশ্রম হয়েছিল তো! তা তোমার রেস্ট হল কেমন? দেখে তো মনে হয় না ঘুমিয়েছ।

পিকু সায় দিল,—তা কোথায় যাচ্ছি? কার সঙ্গে দেখা করতে?

হেসে উঠে ব্রায়ান বলল,—আর তো মিনিট দশেকের অপেক্ষা। তারপর সব প্রশ্নের জবাব পাবে।

—তুমি ডাক্তার দেখিয়েছ? কাল আমার জন্য যা করলে!

হেসে উঠল ব্রায়ান। খুব সহজভাবে বলল,—আমার জন্ম-মৃত্যু সবই তো তোমার জন্য—তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বলে পিকুর দিকে তাকাল। ব্রায়ানের গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পিকু বুঝল যে ও কথাটা হালকাভাবে বলছে না।

মিনিট দশেক পরে ওদের গাড়ি একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্ডিংটার ওপরে লেখা 'ম্যাভেরিক ফ্লাইং ক্লাব'।

গাড়িটা পার্কিং-এ রাখার সময় পিকু দেখল বাড়িটার পেছনে বড় হেলিপ্যাড। বেশ কয়েকটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওরা বাড়ির মধ্যে না ঢুকে পাশের রাস্তা দিয়ে সরাসরি হেলিপ্যাডে চলে এল। বাড়িটার পিছন দিকে—হেলিপ্যাডের আগেই একটা গোল টেবিল পাতা। তাতে তিনটে চেয়ার। একটা চেয়ারে অন্যদিকে মুখ করে একজন বসে আছে। বড় গোল টেবিলটার ওপরে একটা কাঠের বাক্স রাখা।

—ড: কেন, আমরা এসে গেছি। ব্রায়ান দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে।

পিকুও দ্রুত পায়ে ব্রায়ানের পিছু পিছু হাঁটছিল, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল, পরিচিত গলায় ড: কেন যেন মৃদুস্বরে গাইছেন, 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে। ভ্রমিছ দীনপ্রাণে সতত হায় ভাবনা শতশত, নিয়ত ভীতপীড়িত...'

ব্রায়ান ফের বলল,—ড: কেন, আমি আর পিকু এসে গেছি। গান থামিয়ে ড: কেনও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

—বাবাই! পিকু চিৎকার করে উঠল। ছুটে এগিয়ে গেল ড: কেনের দিকে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছে। এতদিন বাবাই ওকে ছেড়ে থাকতে পেরেছে! যাকে গত কুড়িবছর ধরে

প্রতি মুহূর্তে পিকু খুঁজেছে, সে খোঁজা অর্থহীন জেনেও—সেই বাবাই সশরীরে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে? এত নিরুত্তাপ হয়ে?

কান্না আর থামিয়ে রাখতে পারল না পিকু। সে কান্না আনন্দের, না দু:খের, না অভিমানের কে জানে? জয়ন্ত এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল পিকুকে। জয়ন্তর চোখেও জল। খানিকবাদে ধরা গলায় বলে উঠল,—কেমন আছিস রে অদ্ভুত! অনেক বড় হয়ে গেছিস।

পিকু ছোটবেলায় ভূতের নামে খুব ভয় পেত বলে, ওকে মজা করে জয়ন্ত মাঝেমধ্যে অদ্ভুত বলে ডাকত। বলত ওই নাম শুনলে, ভূতেরা পালায়।

চেয়ারে বসে জয়ন্ত বলল,—আমার উপায় ছিল না রে! আমেরিকার সরকার ওদের প্রোজেক্টে আমার সাহায্য পেতে আমার বিরুদ্ধে টেররিজমের চার্জ এনেছিল। যাতে আমি ওদের সাহায্য করতে বাধ্য হই। রিপোর্টে প্রকাশ না করলেও প্লেনে বিস্ফোরণের জন্য আমাকেই দায়ী করেছিল। তা ছাড়া আমিও তো ছিলাম ওই তিরিশজন যাত্রীর একজন। তাই প্লেনে না উঠেও চিরকালের মতো হারিয়ে গেল জয়ন্ত। আমাকে নিয়ে আসা হল এখানে—যেখান থেকে কারুর পক্ষেই আর বেরোনো সম্ভব নয়।

পিকু অভিমানী গলায় বলে উঠল,—মা মারা গেছে দু-বছর আগে। আমার মতো মা'র জীবনও শেষ হয়ে গিয়েছিল তোমার হঠাৎ চলে যাওয়ায়।

জয়ন্ত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল,—আমার পক্ষে কিছু জানা সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তোরাও রেহাই পেতিস না। তাও যে একেবারে চেষ্টা করিনি তা নয়। খুব মন খারাপ লাগলে তোদের বাড়িতে ফোন করে ভয়ে রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিতাম। ওরা বলেই রেখেছিল কোনওভাবে তোরা খবরটা পেলে তোদেরকে মারতে ওরা একমুহূর্তও দ্বিধা করবে না। গত কুড়ি বছর আমার এখানেই কেটেছে প্রোজেক্ট এইচ-এ। দুদিন আগেই প্রোজেক্ট এইচ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমাকে ওরা আজও ছাড়বে না, সব খবর তাহলে বাইরে চলে যাবে।

পিকু বাবাই-এর মুখের দিকে তাকাল। চুল সব পেকে গেছে। মুখে বয়সের সামান্য ছাপ পড়লেও চোখের সেই দীপ্তি, মুখের স্মিত হাসি এতটুকুও ম্লান হয়নি।

বাবার হাতটা চেপে ধরল পিকু,—এবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবই বাবাই। পেয়েছি যখন—সারা পৃথিবীর সঙ্গে লড়তে হলেও লড়ব। কিন্তু তোমাকে কোনওভাবেই ছাড়ব না। সেরকম হলে আমিও এখানেই থেকে যাব। ওখানেই বা আমার কে আছে?

জয়ন্ত হেসে উঠল। বুঝতে পারল ছোটবেলার সেই জেদ-বায়না আজও পিকুর মধ্যে একইভাবে রয়ে গেছে।

জয়ন্ত বলল,—আমাকে যে আবার একটা জরুরি কাজে ফিরতে হবে সোনা, সেখানে শুধু একজনই আমার সঙ্গে যেতে পারবে, তা কাকে নেব? তোকে না ব্রায়ানকে?

—আমাকে বাবাই! জোরে চিৎকার করে উঠল পিকু। পাশে দাঁড়িয়ে পিকুর ছেলেমানুষি দেখে মিটিমিটি হাসছে ব্রায়ান।

জয়ন্ত বলে উঠল,—ব্রায়ান তোর ভাই। সেটা করলে ওর প্রতি অন্যায় হয়ে যাবে।

—তাহলে আমরা দুজনেই যাব।

—না, তা তো হয় না। বললাম না! একজনই শুধু সঙ্গে যেতে পারবে। তার থেকে আমরা অন্যভাবে ডিসাইড করব। তোদের দুজনের মধ্যে চেস হোক তাহলে। যে জিতবে, সে যাবে।

পিকু খুব উৎসাহিত হয়ে লাফিয়ে উঠল,—হ্যাঁ, চেস। চেসেই তাহলে ঠিক হবে।

জয়ন্ত হেসে উঠল,—তুই আমার মতোই হয়েছিস বটে। ছেলেমানুষি আর গেল না। খেল, তবে শুধু এটা বলে রাখি—তুই যার কাছে হেরেছিস সেই ড্যানিয়েলকে ব্রায়ান প্রত্যেকবার হেসে খেলে হারায়। তারপরেও?

একটু চিন্তায় পড়ে গেল পিকু,—তাহলে দৌড়? আমি দৌড়ে খুব ভালো।

ফের হেসে উঠল জয়ন্ত,—পাগল হয়েছিস? ব্রায়ান ঠিক তোর মতো হলেও ও সুপারহিউম্যান। ওকে আমি চিতাবাঘের স্পিড দিয়েছি আর বাঘের শক্তি দিয়েছি—যাতে তোর বিপদে ও কাজে লাগে। তুই পারবি ওর সঙ্গে?

পিকু কাঁদো কাঁদো গলায় এবার বলে উঠল,—কিন্তু আমি যাবই। বলো কী করলে পারব? অসহায় ভাবে ব্রায়ানের দিকে আড়চোখে তাকাল পিকু। ব্রায়ান এখনও মুচকি মুচকি হাসছে।

—লুডো! লুডো খেলবি? পিওর লাক। যে জিতবে সে-ই সঙ্গে যাবে আমার। বোর্ডও আছে সঙ্গে। বলে টেবিলের ওপরে রাখা বাক্সটা খুলে ফেলল জয়ন্ত। বড় লুডোর বোর্ড। পুরোটা ডিজিটাল। কিন্তু ছক্কা নেই। দুদিকে ডিজিটাল প্যানেল, তাতে দুদিকে বাটন।

জয়ন্ত পিকুকে বলল,—এই বাটন প্রেস করলে, 1 থেকে 6 যে-কোনও একটা নাম্বার পড়বে। একবার তুই, একবার ব্রায়ান। যেরকম নাম্বার পড়বে, ঠিক সেরকমভাবে ঘুঁটি আপনা থেকে বোর্ডের ওপর সরে যাবে। ধর তোর 3 পড়ল, তুই আছিস 42-এ, আপনা থেকে ঘুঁটি 45-এ চলে যাবে। তারপর সিঁড়ি বা সাপ—যেরকম থাকবে ওই ঘরে, সেই অনুযায়ী ঘুঁটি সেখানে চলে যাবে। কিন্তু হেরে গেলে কোনওরকম বায়না করা চলবে না—ঠিক তো?

পিকু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এ ছাড়া ওর আর কোনও আশাই নেই। ব্রায়ান লাল গুটি নিল। পিকু সবুজ। বরাবরই পিকু সবুজ নিত। খানিকক্ষণের মধ্যেই পিকুর ঘুটি লাফিয়ে লাফিয়ে 90-এর ঘরে উঠে গেল। কিন্তু, তার পরেই 96-এ সাপের মুখে পড়ে একেবারে 17। ব্রায়ানকেও দু-তিনবার সাপে খেল। পিকুকে আরেকবার 98-এর সাপ খেয়ে সোজা পাঠিয়ে দিল 57-এ।

জয়ন্ত পাশে বসে শুধু মুচকি মুচকি হাসছে। আর ওদের ছেলেমানুষি লড়াই দেখছে। প্রোজেক্ট এইচ-এর পরিত্যক্ত হেলিপ্যাডে লড়াই চলেছে দুই ছেলের মধ্যে। ব্রায়ানের মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। পিকুই মাঝে মাঝে নখ কামড়াচ্ছে। চাল দেওয়ার আগে পায়চারি করে এসে অনির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে কপালে হাত ঠুকে প্রণাম জানিয়ে চাল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সিঁড়ি পেলে লাফিয়ে উঠছে। সাপের মুখে পড়লে রেগে চেঁচিয়ে উঠছে। এটা আজ ওর জীবনমরণের লড়াই। জীবন ফিরে পাওয়ার লড়াই।

কিন্তু আজও ভাগ্য পিকুর সঙ্গে নেই। শেষে ব্রায়ানই জিতে গেল। পিকু মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। জয়ন্ত উঠে পিকুকে জড়িয়ে ধরল।

—তুই সত্যিই বড় হোসনি। আরে, সবসময় আমি তোর সঙ্গে থাকব। যেমন ছিলাম। কাছে থাকলেই কি শুধু থাকা হয়? আর ছোঁয়া না গেলেই কি তাকে দেখা যায় না? ওই ওপরের দিকে তাকা। নীল আকাশ—কোনওদিন ছুঁয়ে দেখতে পারবি? কিন্তু সবসময় সঙ্গে থাকে। আমিও সেরকম।

—আসি পিকু। ভালো থাকিস। জড়িয়ে ধরে আবার ছোট বাচ্চার মতো আদর করে পিকুকে জয়ন্ত। ব্রায়ানও এসে জড়িয়ে ধরে পিকুকে। পিঠ চাপড়ে বলে ওঠে,—বেটার লাক নেক্সট টাইম। বাবা কিন্তু আমাকেই তোমার থেকে বেশি ভালোবাসেন।

জয়ন্ত আর ব্রায়ান একটা হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যায়। ব্রায়ান পাইলটের আসনে বসে। জয়ন্ত অন্য দরজা দিয়ে উঠতে গিয়ে ফের ফিরে আসে। আবার আদর করে জড়িয়ে ধরে। তারপর পিকুর হাতে একটা খাম দিয়ে বলে,—এটা পরে পড়ে দেখিস। মন খারাপ করিস না।

জয়ন্ত ফিরে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠে। ওপরের রোটর ব্লেড চালু হয়েছে হেলিকপ্টারের, মাতালের মতো একটু এদিক-ওদিক করে মাটি ছেড়ে সোজাসুজি বারো-তেরো ফুট উঠে গেল হেলিকপ্টারটা। তারপর ছুটে চলল সামনের দিকে। প্রায় আধকিলোমিটার মতো সোজা গিয়ে বাঁক নিয়ে ওপরের দিকে উঠল হেলিকপ্টার। তখনই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আগুনে জ্বলতে জ্বলতে হেলিকপ্টারটা নীচের দিকে নেমে এল।

পিকু পাগলের মতো দৌড়োতে শুরু করল হেলিকপ্টারের দিকে। মাঝে যেন কোনও পথ নেই। পিকুর পুরো দুনিয়াটা আবার দুলিয়ে দিয়ে আরেকবার ওই দিক থেকেই বিস্ফোরণের আওয়াজ এল। হেলিকপ্টারের ছোট ছোট টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বেশ খানিকটা ছুটে হঠাৎ করে বসে পড়ল পিকু। নাহ, এ ছোটার আর কোনও অর্থ নেই। ওরকম বিস্ফোরণের পরে ওদের কোনওই চিহ্ন থাকবে না।

২৪

দুদিন বাদে সুবীর রায়ের বাড়িতে খামটা খুলেছিল পিকু। ছোট চিঠি।

পিকু, এ চিঠি যখন পড়বি তখন আমি অনেক দূরে চলে গেছি, ব্রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে। এ পৃথিবীটা থাকুক সাধারণ মানুষদের জন্য। তাই ব্রায়ানকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম। শেষ অতিমানব। আমাকে তো এমনিতে মরতেই হত। এই প্রথমবার লুডোয় তোকে ঠকালাম। এমনভাবে প্রোগ্রাম করা ছিল যে লাল ঘুঁটি ছাড়া অন্য যে-কোনও ঘুঁটি নিলেই হারতিস। সেভাবেই সংখ্যাগুলো আসছিল। র‍্যানডমলি নয়। কি, বোকা বানিয়েছি তো!

থাকগে, আসল কথায় আসি। আমি তো মরতে চাইনি পিকু। তোদের সবাইকে নিয়ে বাঁচতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কি যে হল! হঠাৎ করে একদিন বুঝলাম—আমার জীবন আর আমার হাতে নেই। কে যেন হঠাৎ করে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে এক ছোট্ট খাঁচায় বন্দি করে ফেলেছে। সেখানে ভোরের আলো নেই, রাতে তারাজ্বলা আকাশ নেই, সামনে লুডোর বোর্ড নেই, সঙ্গে তোরা নেই। আমি একা। বড় একা।

মন খারাপ করিস না, আমি সবসময় তোর সঙ্গে ছিলাম, থাকবও। আমরা চাঁদের আলোয়, তারার হাসিতে মনে মনে কথা বলব। তোর জন্য একটা ছোট কবিতাও লিখলাম। ছোটবেলায় আমার কবিতা শুনলেই খেপে গিয়ে খিমচে দিতিস। আজ তো সে উপায় নেই। শোনাবই—এ আমারই জীবনের কথা—যার সবটুকু জুড়ে তুই।

বন্ধ খামের এপিঠে-ওপিঠে লিখে যাই কিছু কথা।
খামের ভেতরে স্মৃতি হয়ে থাক কিছু প্রিয় নীরবতা।

(গল্পে উল্লিখিত সব চরিত্র কাল্পানিক)



মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন



75000 বছর আগে, উত্তর সুমাত্রা

অনেক, অনেকটা সময় কেটে গেছে। কবে যে শেষ খেয়েছে, তাই খেয়াল নেই ছেলেটার। আরও তো অনেকে ছিল ওর দলে, কোথায় গেল তারা! শুধু মনে পড়ে দলের বুড়ো লোকটা ওকে ঘুম থেকে ঠেলে উঠিয়ে বলেছিল,—দানব জেগে উঠেছে, পালাতে হবে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

বলে দূরের পাহাড়টার দিকে দেখিয়েছিল। রেগে গেলে ওর মুখ থেকে আগুন বেরোয়।

সত্যিই তাই। ওই মুখ থেকে বেরোনো আগুনের লেলিহান শিখায় সারা আকাশ তখন লাল। বুড়ো মাথা নেড়ে বলেছিল,—আমরা কেউ বাঁচব না। দানব খেপে উঠেছে।

দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছিল ছেলেটা। উপায়ও ছিল না। ওর দিকে তেড়ে আসছিল টকটকে লাল জ্বলন্ত তরল। নীচের মাটি পাথর গলিয়ে ওই লাল তরলের নদী তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছিল। ওর লাল জিভ লোভে লকলক করছিল শিকার ধরার জন্য।

শরীর কেটে গেলে যেরকম হয়, সেরকমই চারদিকের পাহাড়-পর্বত-টিলার ফাঁক দিয়ে বইছিল লাল নদী। প্রচণ্ড গরম। কাছে এলেই—ব্যস! সব শেষ হয়ে যাবে।

যত দূরে থাকা যায়—তাই পাগলের মতো ছুটছিল ছেলেটা। কিন্তু শুধু তো পায়ের দিকে তাকিয়ে ছুটলেই হবে না, ওপর থেকেও ছিটকে আসছিল বড়-বড় পাথর। যেরকম পাথর দিয়ে ওরা শিকার করে, তার থেকে অনেক বড়। আর দানবটার সে কী গর্জন! যেন হাজারটা বাজ একসঙ্গে পড়ছে। আকাশটাও যেন গলে গলে পড়ছিল। কারণ ওটা তো আর নীল রঙের আকাশ নেই। মাথা তুলে তাকালে শুধুই কালো অন্ধকার আর ধোঁয়া। পোড়া কাঠের মতো রং। পুড়ে যাওয়া আকাশটা ছাই হয়ে নেমে আসছিল ছেলেটার চোখেমুখে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল ধোঁয়ায় আর ওই ছাইতে। দু-চোখ জ্বালা করছিল। পাঁচহাত দূরেরও কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

তবু ছেলেটা দৌড়োনো থামায়নি। ও তো কোনওদিন হারতে শেখেনি। ওর মতো পাথর ছুড়ে ওই বড় বড় জানোয়ারগুলোকে কেউ মারতে পারত না। সাঁতরে পাহাড়ি নদী পেরোতেও ওর জুড়ি ছিল না কেউ। গাছের ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে বাঁদর ধরে আনত। কিন্তু জানোয়ারগুলো আজ গেল কোথায়? পায়ের পাতা পুড়ে গেছে, সারা গায়ে ছ্যাঁকা লেগে ফোস্কা পড়ে গেছে, তবুও থেমে যায়নি। থামা মানেই মৃত্যু।

এই ক'দিন মাঝেমধ্যে গুহার মধ্যে লুকিয়েছে। আবার যখন গুহার বাতাসে দমবন্ধ লেগেছে, আগুনের ওই নদীর কাছে চলে এসেছে, ছুটতে শুরু করেছে।

আকাশের দিকে ফের তাকাল ছেলেটা। বড়-বড় পাথর এখনও ছিটকে-ছিটকে আসছে। চারদিক অন্ধকার। আর কি কখনও আলো আসবে না? ওই যে আগে রোজ নীল আকাশে লাল আগুনের থালাটা দেখা যেত, তাকেও কি অন্য সবকিছুর সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে দানবটা? তাই হবে হয়তো। নয়তো এতটা সময়েও অন্ধকার কাটল না কেন? দূরে দানবটার মুখ থেকে যে আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল, তা এখন একটু কমে এসেছে। এরকম আগুন ছেলেটা আগে কখনও দেখেনি। গাছগুলো সব পুড়ে গেছে। সাদা ছাইতে ঢেকে গেছে।

এরকমই একটা পুড়ে যাওয়া গাছের নীচের দিকের ডালে কয়েকটা সবুজ কাঁচা পাতা খুঁজে পেল ছেলেটা। চিবিয়ে খেয়ে নিল। একটু যেন তেষ্টা মিটল। পায়ের তলার মাটি আবার তেতে উঠছে। আবার কি ওই লাল নদী তেড়ে আসছে? হবে হয়তো। ছুটতে যাবে, হঠাৎ চমকে ওঠে—আরে এটা কী! ওরই মতো আরেকজন। খানিকটা দূরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। একটা মেয়ে। ওর থেকে ছোটই হবে। কাছে গিয়ে বুকের ওপর কান পাতল ছেলেটা। একটা ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। বেঁচে আছে তাহলে। পা দুটো পুরো পুড়ে গেছে। মুখটাও বেশ খানিকটা। যাক, একটু খাবার জুটল অবশেষে। জ্ঞান ফেরার আগেই মেরে খেয়ে নেবে।

জ্ঞান থাকলে, ছটফট করলে মারতে কেমন যেন লাগে। পাশ থেকে বড় একটা পাথর কুড়িয়ে আনল। থেঁতলে দেবে মাথাটা। তারপর ধুকপুকুনি থামলে আরামসে খাওয়া যাবে। রেখেও দেওয়া যাবে খানিকটা। আবার কবে এরকম খাবার পাওয়া যাবে কে জানে?

পাথরটা তুলে মারতে গিয়ে হঠাৎ ও থেমে গেল। পাথরটা পাশে নামিয়ে রাখল। ভারি মিষ্টি মুখটা। আর হাতের ওপর দিকে একটা সুন্দর পাতা আঁকা। একটু চুপ করে বসে রইল ছেলেটা। কেউ নেই—এ দানবটা তো সবাইকে খেয়ে ফেলেছে। এই হোক না ওর বন্ধু।

গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে মেয়েটার চোখের পাতায় বোলাতে লাগল ও। খানিকবাদে চোখের পাতাটা নড়ে উঠল। জ্ঞান ফিরছে। বড়-বড় চোখ মেলে মেয়েটা তাকাল ওর দিকে। উঠে বসারও ক্ষমতা নেই।

কিন্তু এখানে থামলে তো চলবে না। মেয়েটাকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল ছেলেটা, লাল গরম নদী আর ছুটে আসা পাথর এড়িয়ে। দূরে একটা অন্যরকম গর্জন শুরু হয়েছে। এ আওয়াজটা ওর চেনা। এটা ওই দানবটার থেকেও সাংঘাতিক। সমুদ্রের। যখন তেড়ে আসে তখন পালানোর কোনও উপায় থাকে না। শেষে সমুদ্রকেও কি ওর দলে নিয়ে নিয়েছে দানবটা? কী সাংঘাতিক!

ত্রিবান্দ্রম, 15 সেপ্টেম্বর

অনিলিখা সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছিল। খোলা চুল উড়ছিল হাওয়ায়। পায়ের নীচে সরে সরে যাচ্ছিল কোভালাম বিচের মসৃণ বালি। বিচের ওপরেই একটা পাঁচতারা হোটেলে ও এসে উঠেছে অফিসের কাজে। সারাদিন মিটিং চলেছে। দিনের শেষে সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত দেখতে বেরিয়ে পড়েছে একাই। কিন্তু সূর্যাস্তের দেখা মেলেনি। মেঘের ফাঁকে চোখ এড়িয়ে কখন যে সূর্য শেষ ডুবটা মেরেছে তা ঠিক বোঝা যায়নি। উধাও হওয়ার আগে একটা সোনালি আলোর রেশ দিগন্তরেখার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

মুগ্ধ হয়ে ওই দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল অনিলিখা। তারপর ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে বালির ওপর হাঁটছিল। আর শুনছিল ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের কথা বলা। বিচে এখন বেশি লোক নেই। এখানে বেশিরভাগই প্রাইভেট বিচ—হোটেলগুলোর নিজস্ব। কয়েকটা কুকুর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে কয়েকজন বিদেশিকে দেখা যাচ্ছে। এরা বিদেশ থেকে এসে এই হোটেলগুলোতে লম্বা ছুটি কাটিয়ে যায়। তাই কোনও তাড়া থাকে না। আজ সমুদ্রে কেউ সাঁতারে নামেনি। কেউ কেউ শুধু মাঝে মাঝে শান্ত সমুদ্রে পা ভিজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আনমনে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল অনিলিখা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, দূরে উলটোদিক থেকে একজন এগিয়ে আসছে। খুব পরিচিত হাঁটাটা। চেহারাটা স্পষ্ট হতে শুরু করল। রাজা কি?

ঠিক তাই—আরেকটু কাছে আসতেই অনিলিখা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। বেশ কয়েকবছর আগে রাজার সঙ্গে একই সঙ্গে হার্ভাডে পড়েছে অনিলিখা। সাবজেক্ট যদিও আলাদা ছিল। রাজার সাবজেক্ট ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। তবু ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দোনেশিয়ার ছেলে। পুরো নাম ছিল অর্ধরাজা। ওরা সবাই রাজা বলেই ডাকত। এমনিতেও ইন্দোনেশিয়াতে কেউ পুরো নাম ধরে নাকি ডাকে না। তা ও এখানে কী করছে?

—রাজা! বলে চেঁচিয়ে উঠল অনিলিখা।—তুমি এখানে? ভারতে?

রাজা একটু চমকে উঠে হাসিমুখে এগিয়ে এল।

—এখানে কী করছ? ভারতে এসেছ আর আমাকে জানাওনি?

—হ্যাঁ, হঠাৎই প্ল্যান করেছি। তা তুমি তো এখানে থাকো না?

—না, অফিসের কাজে এসেছি। তা তুমি আছ কোথায়?

—এখানেই। কাছেই একটা হোটেলে। অনেকদিন কোথাও বেড়ানো হয়নি। তাই হঠাৎই ছুটিতে আসার প্ল্যান করলাম। তোমার কথা খেয়াল হয়নি।

—কতদিন আছ? কলকাতা আসছ কি?

—নাহ, কলকাতায় আর যাব না। কালই ফিরে যাচ্ছি। বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজা বলে উঠল,—এখন আমার একটু তাড়া আছে। তোমার নাম্বারটা দাও। আমেরিকায় ফিরে পরে কথা বলব।

অনিলিখার নাম্বারটা নিয়ে যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকেই দ্রুত আবার ফিরে চলল রাজা। অনিলিখা একটু অবাকই হল। এতদিন বাদে দেখা—সামান্য কয়েকটা কথা বলারও সময় নেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। প্রথমদিকে ফোনে, ই-মেলে যোগাযোগ ছিল। পরে সেই যোগাযোগটা রাখা দুজনের পক্ষেই আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও...।

সত্যি জিনিয়াস বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল রাজা। তা না হলে ইন্দোনেশিয়ার একটা ছোট গ্রাম থেকে এভাবে হার্ভাডে পড়ার সুযোগ করে নেওয়া সহজ ছিল না। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়। সব বিষয়ে দারুণ কৌতূহল ছিল রাজার। সব সময় বই নিয়ে বসে থাকত। যাকে বলে বইয়ের পোকা। তবে শুধু পড়ার বই নয়, সবরকমের বই। তবে মজার বিষয়—আমেরিকায় পড়তে গেলেও আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুব খারাপ। বলত—সারা পৃথিবীর মধ্যে খাঁটি মানুষ যদি খুঁজে পেতে হয় তাহলে সুমাত্রায় যেতে হবে। তা খাঁটি মানুষের সংজ্ঞাটা কী? ওর মতে আমাদের জিনে এত ভেজাল ঢুকেছে যে সত্যিকারের মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যত বড় সভ্যতা তত বেশি ভেজাল। সত্যিকারের মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, তারা নাকি আছে সুমাত্রার জঙ্গলে। তাদের জীবনে গত হাজার বছরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ ব্যাপারটা সবার কাছেই খুব হাস্যকর ছিল। কিন্তু এ নিয়ে রাজাকে খেপালেও ও খেপত না। পরের দিকে প্রসঙ্গটা তুলতই না।

রাজার ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখা উচিত ছিল। আর কোন হোটেলে উঠেছে, সেটাও তো ঠিক জানা হল না। বিচ এখন প্রায় ফাঁকা। সূর্য ডুবে গেছে। দূরের হোটেলগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। ফেরার রাস্তা ধরল অনিলিখা।

জেনুয়ার জেল, 1299, 16 জানুয়ারি
(বর্তমান ইতালি) মার্কোপোলো ও পিসা

রাস্তিশিয়ান দে পিসা ও মার্কোপোলো দুজনে একই সঙ্গে জেনুয়ার জেলে বন্দি। ভেনিস যুদ্ধে হেরে গেছে জেনুয়ার কাছে। ভেনিসের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মার্কোপোলো তাই জেনুয়ার জেলে। তার সঙ্গে একই সেলে পিসা। পিসা ভালো গল্প লেখে। মার্কোপোলোকে সঙ্গী পেয়ে সে ভারি খুশি। চিন-সুমাত্রা-ভারতে বহুবছর কাটিয়েছে মার্কোপোলো। তাই ওর কথা শুনে পিসা লিখে চলেছে ভ্রমণের বিবরণ।

—তারপর মার্কো, তুমি ল্যাম্ব্রির (বর্তমান সুমাত্রা) কথা বলছিলে কাল—তারপর কী হল?

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। থাইল্যান্ড থেকে ম্যালে পেনিনসুলা ধরে ল্যাম্ব্রিতে পৌঁছোলাম। কিন্তু তখন হাওয়া ঠিক দিকে বইছিল না। বাধ্য হয়ে ওখানে থামতে হল। ওখানকার লোকেদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলি। ওখানে সবাই মূর্তিপূজা করে। আগে বেশিরভাগ হিন্দু ছিল। পরে আরব দেশের সওদাগরদের প্রভাবে, অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে।

ওদের সম্বন্ধে একটা কথা শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না, আর যদি বা করো, যারা তোমার লেখা পড়বে তারা তো করবেই না। ওখানে কিন্তু লোকেদের বিশাল বিশাল লেজ। বেশ মোটা লেজ।

ইয়া তাগড়াই চেহারা। ওদের অনেকে পাহাড়ে থাকে। ওখানে পৃথিবীর সেরা কর্পূর পাওয়া যায়। তার দাম সোনার থেকেও বেশি। কর্পূর আর মশলাপাতি কিনতে প্রচুর সওদাগর ওখানে যায়। ওখানকার লোকেরা রুটি

খায় না। খায় শুধু ভাত। সঙ্গে দুধ আর মাংস। ওখানে কিছু বিশাল বিশাল গাছ আছে। আকাশছোঁয়া। এমন ঘন তাদের পাতা যে মাথা তুললে আকাশ দেখা যায় না। কিন্তু ওই গাছের ছাল খুব পাতলা। ছালের নীচে একধরনের ময়দার মতো জিনিস থাকে। ওখানকার লোকেরা ওই ময়দা দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করে খায়। ওখানকার পাহাড়ে অনেক সোনা পাওয়া যায়। তোমাদের পিসায় যেমন পাথর, ওখানে তেমন সোনা অফুরন্ত। ওখানকার নামই তাই স্বর্ণদ্বীপ।

—তাই নাকি? তা তুমি সেখান থেকে সোনা নিয়ে আসনি?

—আমাকে কুবলাই খান এত দামিদামি রত্ন দিয়েছিল যে তা সাবধানে নিয়ে আসতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। তা ছাড়া আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের রাজকন্যা ছিল—তাকে ছেড়েই বা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি কী করে! পারস্যের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু আমার ভরসাতেই রাজকন্যাকে পাঠিয়েছিল কুবলাই খান। সাবধানে তাকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই ওকে ফেলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তো আর ল্যাম্ব্রির সোনাদানা আর মশলাপাতি জোগাড় করতে যাইনি। নেহাতই চিন থেকে ভেনিস যাওয়ার পথে ওখানে আটকে পড়েছিলাম, তাই। অনুকূল হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আমি ল্যাম্ব্রিতে পাঁচ মাস বসেছিলাম। আমার সঙ্গীরা মহাফূর্তিতে ছিল, আর আমি রোজ ভাবতাম কবে ভারত রওনা হতে পারব।

—তা যা বলছিলে। ওখানকার লোকগুলো কেমন?

—ওখানে বেশিরভাগ লোক ব্যবসা করতে আসে। তারা ভদ্র। তারা ভারত, চিন এসব জায়গা থেকে আসে। কিন্তু, একটু ভেতরে যাও, ওখানকার জঙ্গলে পাহাড়ে অসভ্য লোকের বাস। তারা জ্যান্ত মানুষ ধরে খায়। তারা সব আধাপশু। তবে তাদের থেকেও খারাপ আরেকদল লোক আছে। পাহাড়ের গুহাতে অনেক গভীর জঙ্গলে থাকে ওরা।...থাক সে কথা।

—কেন, থাকবে কেন? বলো!—আমাকে তো সবই বলছ।

—আচ্ছা, বলছি। কিন্তু ওদের কথা খবরদার লিখো না। তাহলে আমি-তুমি কেউ রেহাই পাব না। আমি সংক্ষেপে বলছি।

ফের বলে ওঠে মার্কো,—বুঝতেই পারছ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে আমি যাব না তা কি হয়! তার জন্যই তো চব্বিশ বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। শুধু সোনার লোভে নয়। আমাকে ওখানকার একজন ওদের কথা বলেছিল। ওদের কাছে গেলে মানুষ নাকি বাঁচে না। ওদের গায়ে নাকি সাংঘাতিক জোর। আর তেমনি হিংস্র। তারপর কৌতূহলবশত আমি শ-পাঁচেক লোক নিয়ে ওরা পাহাড়ে যেখানে থাকে সেদিকে গিয়েছিলাম।

তখন শীতের সময়। আমরা প্রায় পাঁচদিন জঙ্গল পেরিয়ে ওই জায়গার কাছে গিয়েছিলাম। জঙ্গলে ঘেরা বড় পাহাড়। ভারি সুন্দর সে জায়গা। তারই ওপরের দিকে ওদের বাস। ওদের কথা অন্যদের বললে নাকি অভিশাপ লাগে। এটাই নাকি নিয়ম। ওদের আমি দেখিনি। কিন্তু আমার দলে পাঁচশো জন ছিল। তিনশো জনের একটা দল প্রথম দিন গিয়েছিল, একজনও ফেরেনি। তারপর আরও পঞ্চাশ জন যায়, তারাও ফেরেনি। পরে এক স্থানীয় লোক আমাকে বলে যে ওখানে গেলে কেউ নাকি ফেরে না। লোকটা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই বলেছিল।

এরপর আমরা ওখান থেকে ফিরে আসি। একমাস বাদে পালে হাওয়া লাগলে ওখান থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আর যাই লেখো না কেন—ওই পাহাড়ের লোকগুলোর কথা লিখো না। ওরাই নাকি আদি, আসল মানুষ।

—ঠিক আছে, কথা দিলাম। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। তোমার দলের অত লোক বিপদে পড়ল, মারা গেল—আর তুমি একবারও গিয়ে দেখলে না। অসম্ভব! তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। ভেনিস-জেনুয়ার যুদ্ধে তোমার বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে ঘোরে। কীভাবে তুমি তরবারি

নিয়ে নিজে যুদ্ধে নেমেছ, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছ—সেই কথা। তোমার জাহাজ সবার পরে জেনুয়ার অধীনে আসে। তোমাদের পুরো সৈন্যদল যখন আত্মসমর্পণ করেছে, তুমি তখনও হাল ছাড়োনি। তুমি বলতে চাও যেখানে তোমার দলের অত লোক মারা পড়ল, তুমি সেখান থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এলে! এ কথা আমি বিশ্বাস করব! ঠিক করে বলো কী হয়েছিল।

সেলের অন্ধকারে প্রায় মুখ লুকিয়ে মার্কোপোলো আস্তে-আস্তে বলে উঠল,—পিসা, আমাদের চারপাশে যা হয় সব কি আমাদের জানা? সব কি আমরা বুঝি? ওই আকাশের দিকে দ্যাখো। তারাগুলো ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় ফিরে আসে। সূর্যটা রোজ আমাদের পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। অতটুকু একটা জিনিস—কিন্তু কী তেজ! আমরা কি এসব বুঝি? ঠিকই ধরেছ। আমিও ছিলাম ওদের সঙ্গে। দুটো অভিযানেই। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। এতটুকুই তোমার জানার জন্য যথেষ্ট। নাও, এবার তোমার গল্প শোনাও।

—ঠিক আছে, ল্যাম্ব্রির কথা তো অনেক হল। তোমাকে আজ আমার লেখা একটা গল্প বলি, আশাকরি ভালোই লাগবে।

পিসা ওর গল্প বলতে শুরু করে জেলের আধা অন্ধকার খুপরিতে।

সানফ্রান্সিসকো, 20 আগস্ট

প্রফেসার জ্যাসন ইগার ফোনটা অন করলেন। 38টা মিসড কল। 12টা মেসেজ। মিসড কলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিজের উদ্দেশ্যে ধিক্কার সূচক একটা আওয়াজ করে মাথা নাড়লেন। নাহ। এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়াটা উচিত হয়নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন—আলু না পেঁয়াজ কিনতে! নাকি দুধ? পথে হঠাৎ করে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। আর এটাই কাল হল। আলোর রেখা হঠাৎ হঠাৎ করে জ্বলে উঠে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ চোখে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয়নি। কমেট শাওয়ার। দুর্লভ ঘটনা। অবাক হয়ে দেখছিলেন প্রকৃতির এই খেলা। সঙ্গে টেলিস্কোপও ছিল। তাতে চোখ লাগিয়ে কাটিয়েছেন বেশ কয়েক ঘণ্টা। তারপরে ওনার অভ্যাসমতো লিখে রাখতে চেয়েছিলেন। তা লিখতে লিখতে কখন যে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন কে জানে!

কেউ যাতে জাগতিক কোনও ব্যাপারে বিরক্ত না করে তাই ফোনটা শুরু থেকেই বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর চালু করা হয়নি। আরেকবার ফোনে চোখ রাখলেন। শেষ মেসেজটা লোকাল পুলিশের। তার মানে পুলিশেও খবর দিয়েছে! কী অবস্থা! জ্যাসন কি বাচ্চা নাকি, যে হারিয়ে যাবে! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কয়েকমাস আগে একটা কমেটের কক্ষপথের জটিল অঙ্ক মিলছিল না বলে, বাড়িতে না জানিয়ে তিনদিন একটা হোটেলে ছিলেন। তা, সেটা তো আর রোজকার ব্যাপার নয়!

বাড়িতে ফোন করতে যাবেন, হঠাৎ গাড়ির কাচের জানলায় ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে মুখ ঘোরালেন। দুজন লোক। অচেনা। নির্ঘাৎ পুলিশের লোকই হবে। ওনার খোঁজে এসেছে। দরজার লক খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বলতে যাবেন—তার আগেই মুখের ওপর কে যেন রুমাল চেপে ধরল। কিছু বলার সুযোগ দিল না। জ্ঞান হারানোর আগে জ্যাসন শুধু এটুকুই বুঝলেন যে তারা পুলিশের লোক নয়। ওনার সাবজেক্টেরও লোক নয়। কমেট শাওয়ার নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। ওনাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে।

জোহানসবার্গ, 20 আগস্ট

মার্কের মনটা আজ খুব খারাপ। এরকম মন খারাপ হলে উনি সাধারণত টেলিস্কোপে চোখ রাখেন। দূরের তারাগুলোর দিকে তাকালে নিজের সমস্যাগুলোকে অনেক ছোট ছোট লাগে। হারিয়েই যায়। কিন্তু দিনের বেলা সে উপায় নেই। খবরের কাগজে চোখ বোলালেন। নাহ, খবরগুলো পড়তে ইচ্ছে করছে না। টিভি চালালেন। বাস্কেটবল ম্যচ দেখাচ্ছে। কিন্তু তাতেও দু-মিনিটের বেশি বসে থাকতে পারলেন না। মনটা বড় অস্থির লাগছে। পাশের ঘরে রবিন শুয়ে। একবার গিয়ে আবার ফিরে এলেন। রবিনের অবস্থা আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। অসহায় দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। শরীরের সব মাসল জবাব দিয়ে দিয়েছে। শুধু অনুভূতি আর বাঁচার ইচ্ছেটা রয়ে গিয়েছে। আর ক'টা দিন। তারপর সব শেষ। পনেরো বছরের ছেলেটাকে আর কোনওদিন দেখতে পাবেন না মার্ক।

অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও চিকিৎসা নেই এ অসুখের। গত ছ'মাস ধরে রবিন শয্যাশায়ী। হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। কথাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। তবু তো প্রাণ আছে। একটা উপলব্ধি আছে। চলে গেলে এ-ঘরে আর এক মুহূর্তও কাটাতে পারবেন না মার্ক।

ফের রবিনের ঘরে ঢুকলেন মার্ক। পাশে গিয়ে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ওর মা অনেক বছর আগে মারা গেছেন। মার্কের কাছেই মানুষ রবিন। অন্য বাবাদের তাদের ছেলেদের সঙ্গে যতটা যোগাযোগ থাকে, মার্কের সঙ্গে রবিনের যোগাযোগ তার থেকে অনেক বেশি। কাজের বাইরে বেশিরভাগ সময় কাটে ছেলেকে নিয়ে। যখন ও হাঁটতে পারত, তখন ওকে নিয়ে মার্ক নানান জায়গায় ঘুরতে যেতেন। কিন্তু শেষ কয়েকমাস ওকে নিয়ে কোথাও-ই যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, রবিনকে নিয়ে হুইলচেয়ারে ঘুরতে হবে। গাড়ির সিটে কোলে করে নিয়ে বসাতে হবে। নানান ঝামেলা।

কথাটা খেয়াল হতেই মার্কের মনে হল—আজকেই, হ্যাঁ, আজকেই তো রবিনকে নিয়ে বেরোনো যায়। কাছেই একটা জায়গায় লায়ন সাফারি আছে। সেখানে নিয়ে গেলে রবিনের খুব ভালো লাগবে। যেই ভাবা—সেই কাজ। আধঘণ্টার মধ্যে রবিনকে নিয়ে মার্ক বেরিয়ে এলেন।

লায়ন সাফারি বাড়ি থেকে দেড়ঘণ্টার রাস্তা। গাড়ি জোহানেসবার্গ থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক ছুটে চলল প্রিটোরিয়ার দিকে। তারপর ডানদিকে অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে উঠল। এ রাস্তাটা বিশেষ নিরাপদ নয়। কয়েকটা জায়গায় রাস্তার ধারে লেখাও আছে যে এখানে কিডন্যাপিং ও মার্ডার বেশি হয়। সাউথ অফ্রিকায় অবশ্য এরকম ওয়ার্নিং প্রায়শই দেখা যায়।

মার্ক একবার রবিনের মুখটা দেখে নিলেন। কথা না বললেও রবিনের মুখে একটা আনন্দের ছাপ। ওর মুখে এই হাসির ছোঁয়া দেখতে চাঁদে যেতেও রাজি মার্ক। স্টিরিয়োর গানটা চালিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে ব্রেক করে গাড়িটাকে কোনওভাবে থামাতে পারলেন মার্ক। রাস্তা জুড়ে একটা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে! কী ব্যাপার! দেখতে গাড়ি থেকে নামলেন। ট্রাকের দিকে এগোতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওকে জাপটে ধরে মুখের ওপর একটা রুমাল চেপে ধরল। 'রবিন' বলে চেঁচানোরও সময় পেলেন না মার্ক। অবশ্য চেঁচালেও রবিন তো আর ছুটে এগিয়ে আসত না। অচৈতন্য মার্ককে টেনে নিয়ে তোলা হল ট্রাকের পিছনে।

মেক্সিকো সিটি, 19 আগস্ট

পেড্রো ওর দশ বাই দশফুট সেলে চুপচাপ বসেছিল। সময়টা যেন এই সেলের অন্ধকারের মতোই থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভাবছিল নিজের কৃতকর্মের কথা। ওর ক্ষেত্রে কি এ শাস্তিটা লঘুদোষে গুরুদণ্ড নয়? সরকারের কিছু খারাপ কাজের কথা ফাঁস করেছিল ও। কীভাবে সরকার সবার ফোন ট্যাপ করে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে তথ্য জোগাড় করে, অন্য দেশের গোপনীয় খবর সংগ্রহ করে—এসব নিয়ে

বিদেশের একটা পত্রিকায় লিখেছিল ও। তারপরই ওর ওপর একটা সাজানো খুনের চার্জ আনা হল। ফলত দশ বছর জেল। হাইসিকিউরিটি জেল। কিন্তু সে জেলেরও ক্ষমতা ছিল না 170 IQ-র পেড্রোকে রোখার। দু-বছরের মধ্যে জেল থেকে পালাল পেড্রো।

কথাটা মনে পড়তেই হেসে উঠল পেড্রো। জেলে কাঠের কাজ করতে হত ওদের। রোজ একঘণ্টার জন্য জেলের ওয়ার্কশপে কাঠের নানান জিনিস বানাতে দেওয়া হত। জেলরক্ষীদের সতর্ক প্রহরার মধ্যেই সবার চোখ এড়িয়ে একটার পর-একটা দরজার চাবি বানিয়ে ফেলল পেড্রো। প্রত্যেকটা দরজার তালা আলাদা, চাবি আলাদা। প্রথম দিকের কয়েকটা দরজার চাবির ছাঁচ তৈরি করা অতটা শক্ত ছিল না, কারণ এই পথ দিয়েই ওদের রোজ ওয়ার্কশপে কাজে নিয়ে যাওয়া হত। একবার তালার দিকে তাকিয়ে চাবি আন্দাজ করে সবার চোখ এড়িয়ে ওয়ার্কশপে চাবি তৈরি করা।

জেলের কয়েকজন সঙ্গী অবশ্য একথা জানতে পেরেছিল। তবে তারা পেড্রোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা জানত যে যদি জেল থেকে পালাতে হয়, তাহলে এই অসামান্য প্রতিভাবান বন্দির সাহায্যেই পালাতে হবে। প্রথম চারটে গেটের চাবি তৈরি করতে সময় লেগেছিল দু-মাস। কারণ শুধু দু-সেকেন্ড সময় পাওয়া যেত ওই চাবি টেস্ট করার। সঙ্গের রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে একবার কি-হোলে কোনওক্রমে মোচড় দিয়ে ছাপ তুলে নিত।

ওগুলো তো তা-ও সহজ ছিল। মুশকিল হল পরের ছ'টা গেট—যেখান দিয়ে পেড্রো কখনই যাওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তা সে যত শক্ত কাজই হোক না কেন। তিনদিন জেলারের চোখ এড়িয়ে অসম্ভব রিস্ক নিয়ে বাকি কয়েকটা গেটের তালা একনজর দেখতে পারল পেড্রো। শুধু তার ওপর আন্দাজ করেই চাবি বানিয়ে ফেলল। ফলত ছ-মাসের অবিরাম চেষ্টার পর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে দেশের সব থেকে হাই সিকিউরিটি জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেল।

দেশ ছেড়ে পালানোর অনেক চেষ্টা করেছিল পেড্রো। সম্ভব হয়নি। ছ'মাস পরে আবার ফিরতে হল শ্রীঘরে। তারপরে আরও একবছর কেটে গেছে। এবারেও একই জেলে। কিন্তু এবার আরও অনেক বেশি সতর্কতা। জেলের মধ্যে 322 নং সেলে যে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান অপরাধী আছে তা জেলের জমাদাররাও জানে। তাই সবদিক দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা। কোনও ফাঁক নেই। আগের বারের মতো পেড্রোকে কাঠের কাজ করতে দেওয়া হয় না, পোশাক তৈরি করতে দেওয়া হয় না। তিন-চার জন সিকিউরিটি গার্ড আসে খাওয়ার সময়। খুব সাবধানে খাবার দিয়ে চলে যায়। কোনও কথাও বলে না।

কিন্তু তা সত্বেও একটা উপায় পেড্রো বার করেছে। সময় একটু বেশি লাগবে। বছরখানেক লেগে যেতে পারে। তবু একটা জিনিস পেড্রো বুঝতে পেরেছে গত দু-বছরে। জীবন কত দামি। তাকে দশ বাই দশ ফুটের একটা ঘরে শেষ করে দেওয়া যায় না। আর এই আশার নামই জীবন। জীবনে কখনও এই আশা ছাড়তে রাজি হয়নি পেড্রো।

একটু ঝিমোচ্ছিল পেড্রো। হঠাৎ সেলের দরজা খুলে গেল। পরিচিত যারা আসে তাদের সঙ্গে আরও একজন আজকে। কী ব্যাপার? ওর প্ল্যানের কথা টের পেয়ে গেল নাকি?

ওকে নিয়ে এগিয়ে চলল লোকগুলো। অন্যদিনের মতো সতর্ক দৃষ্টি নেই ওর ওপর। সোজা জেলারের কাছে। পরের আধঘণ্টা স্বপ্নের মতো কাটল পেড্রোর। ও মুক্ত। সম্পূর্ণ মুক্ত। ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে একটা কাজ করতে হবে। কী কাজ? খুব খারাপ কোনও কাজ? নাকি ওকে মেরে ফেলারই কোনও চক্রান্ত করেছে এরা? সাবধানি হয়ে লোকটার সঙ্গে এগোতে লাগল পেড্রো।

অবশেষে খোলা আকাশের নীচে আসতেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল। মৃত্যু হোক, তবু তা আসুক খোলা আকাশের নীচে। জেলের ঠিক বাইরেই একটা দামি মার্সিডিজ অপেক্ষা করছিল ওর আর সঙ্গের লোকটার জন্যে। গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। পেড্রোও পিছু-পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ফিনিক্স-সোনোরান ডেজার্ট, 22 আগস্ট

অটিজম রিসার্চ সেন্টার। অবশ্য নামেই তা। রিসার্চের কাজের সঙ্গে এই নামের কোনও যোগাযোগ নেই। অনেক বাচ্চা আছে। তাদের মধ্যে অটিস্টিক বাচ্চা যেমন আছে, স্বাভাবিক বাচ্চাও আছে। কোত্থেকে এসব বাচ্চা ওরা জোগাড় করে তা রহস্য। এদের খোঁজও কেউ নিতে আসে না। কিন্তু এসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যায় না।

আজও একটা জিনিস অবাক লাগে ক্রিসের। এই রিসার্চ সেন্টার চলে কার টাকায়? শুনেছে বড় একটা গ্রুপ এর পিছনে আছে। কিন্তু তাদের ম্যানেজমেন্টের কাউকে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না।

অবশ্য এ নিয়ে ক্রিসের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। ও যথেষ্ট টাকা পায়। সরকারি রিসার্চ সেন্টারগুলোতে, এমনকী সেরা প্রাইভেট রিসার্চ সেন্টারগুলোতে এর অর্ধেক স্যালারিও পেত না। আর শুধু ও নয়, ওর সতীর্থ বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তাই বিশেষ আগ্রহ না দেখানোই ভালো।

আজকের দিনটা বিশেষ একটা দিন। প্রায় তিনমাস ধরে একটা নতুন জিনথেরাপির ওপর গবেষণার পর প্রথম টেস্ট হবে একদল বাচ্চার ওপরে। এদের প্রত্যেকের ওপরেই একটা বিশেষ ধরনের জিনথেরাপি করা হয়েছে। বিশেষ একরকম রেট্রো-ভাইরাস এদের জিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকদিন আগে। তা নিয়মমাফিক কাজ করছে কিনা তা আজ দেখা হবে।

ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল ক্রিস। মরুভূমির মধ্যে খানিকটা বেখাপ্পা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটা। যতদূর দেখা যায়—সোনোরান ডেজার্ট, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ। লোকজনের চোখের আড়ালে বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু পাঁচিল, বাইরে কড়া নিরাপত্তা। তার মধ্যে এই বাড়ি, বাইরে এখন তাপমাত্রা 50 ডিগ্রির মতো। প্রচণ্ড চড়া রোদ। দু-মিনিটের বেশি দাঁড়াতে কষ্ট হয়। বাইরের এই রুক্ষতা যেন ক্রিসের চরিত্রের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বাচ্চাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও কোনও দ্বিধা হয় না ক্রিসের। যারা আসে তারা সব গিনিপিগ। কেউ মারা গেলেও কারুর কিছু আসে যায় না।

ঘরের ভেতরে ঢুকে এল ক্রিস। তারপর ঘরের অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে লবি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। খানিকটা এগিয়ে ডানদিকের রিসার্চ ল্যাবে ঢুকে পড়ল। পল, রবিন ও অন্যান্য অ্যাসিট্যান্টরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। পাশের ঘর আর এ-ঘরের মধ্যে একটা কাচের দেওয়াল আছে। তা দিয়ে পাশের ঘরে কী হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কফি মেশিন থেকে কফি নিয়ে চেয়ারে এসে বসল ক্রিস।

—আমরা রেডি?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এবার শুরু করব। রবিন বলে উঠল।

পাশের ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হল। দেখার জন্য প্রত্যেকে নাইট-ভিশন চশমা পরে নিল।

এবার সুইচ টিপে পাশের ঘরের দরজা খুলে দিল রবিন। দরজা দিয়ে আটটা বছর তিন-চারেকের বাচ্চা ঘরে ঢুকল। ঘরে নানান খেলার জিনিস ছড়িয়ে রাখা আছে। কয়েকটা পাজলের ব্লক, চেসবোর্ড, বেশ কয়েকটা গাড়ি, পুতুল। ওরা ঢুকে খেলনাগুলো নিয়ে খেলায় মেতে উঠল! ঘরের অন্ধকারের জন্য কারও কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না। একটা বাচ্চা দু-মিনিটের মধ্যেই দুরূহ রুবিক কিউব পাজল সলভ করে ফেলল।

পল বলে উঠল,—আশ্চর্য! দেখলেন ক্রিস!—কী অসামান্য ইনটেলিজেন্স। এবার আমি আস্তে-আস্তে ঘরের উষ্ণতা কমাব আর সঙ্গে সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাড়াব।—রবিন বলে উঠল।

ঘরটা আস্তে-আস্তে ধোঁয়ায় ভরে গেল। বাইরে থেকে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাচ্চাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না।

উত্তেজনায় রবিন ক্রিসের হাত ঝাঁকিয়ে বলে উঠল,—কাজ করছে! 15 ppm আমরা কোনওভাবে সহ্য করতে পারতাম না। অথচ এখনও ওদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা যা সহ্য করতে পারি ওরা তার থেকে অনেক বেশি সহ্য করতে পারছে। আর একটুক্ষণ দেখা যাক।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। মনিটরগুলোতে বাচ্চাগুলোর হার্টবিট, পালসরেট, অন্যান্য শারীরিক অবস্থা দেখা হচ্ছে।

হঠাৎ পল হাত তুলল,—শিগগিরি ওদের বার করো—দুটো বাচ্চা সহ্য করতে পারছে না। ওই দ্যাখো।

খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে দুজন ঠিক স্বাভাবিক নেই। খেলনা ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ অপারেশন শুরু। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক ওই ঘরে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে বার করে নিল। মেডিক্যাল এমার্জেন্সি টিম রেডি ছিল। তাড়াতাড়ি ওদের দেখতে শুরু করল। কোনও বিপদ হয়নি। বাচ্চাদুটো মোটামুটি ঠিকই আছে।

তবে এক্সপেরিমেন্ট সেদিনের মতো শেষ। ক্রিস পলকে বলে উঠল,—আমরা ঠিক দিকেই এগোচ্ছি। তবে একেক জনের ওপর প্রভাবটা একেকরকম হচ্ছে। আমাদের আরও এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। আরও টেস্ট সাবজেক্ট লাগবে। বেশ কিছু বাচ্চা আরও দরকার।

ত্রিবান্দ্রম, 20 সেপ্টেম্বর

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে গানের সিডি কেনার জন্য কেরালা গভর্নমেন্টের একটা দোকানে ঢুকল অনিলিখা। বেশ বড় দোকান। শুধু স্থানীয় রাগাশ্রয়ী গান, বাঁশির সিডি নয়, নানান ধরনের চাদর, বিশেষ ধরনের শাড়ি, কথাকলি নাচের মুখোশ, চন্দন কাঠের ওপর কাজ করা মূর্তি, বিভিন্ন স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র—সবই আছে।

চন্দন কাঠের ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি আর-একটা শাড়ি কিনে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ অনিলিখার চোখ পড়ল পাশের গাড়িতে। মাঝের সিটে একটা গুন্ডামতন চেহারার মাথা কামানো কালো মুশকো লোক বসে আছে। আর তার পাশে ঠিক সেরকমই এক নিতান্ত ভদ্রোচিত চেহারার লোক। ফরসা রং, চোখা চোখা নাক মুখ, সাদা দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। লোকটা সিটে ঘাড় এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। সায়েন্টিস্ট স্বরাজ পল না?

অনিলিখার গাড়ির ড্রাইভার গাড়িতে নেই। আশেপাশে কোথাও গেছে। তাকে ফোন করে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল অনিলিখা। পাশের গাড়িটা লক্ষ করতে লাগল। পাশের গাড়ির ড্রাইভার একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট নিয়ে খানিকবাদে ফিরে এল। তারপর তাড়াহুড়ো করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আধমিনিটের মধ্যে অনিলিখার গাড়ির ড্রাইভার কিষেণও এসে উপস্থিত। চট করে গাড়িতে উঠে অনিলিখা এয়ারপোর্টের উলটোদিকে গাড়ি চালাতে বলল।

—কিষেণ, ওই যে দূরে সাদা টয়োটা গাড়িটা দেখছ ওটাকে ফলো করো। খুব দরকার।

—এয়ারপোর্টে যাবেন না? আপনার তো ফ্লাইট আছে!

—-এয়ারপোর্ট পরে। আগে ওই গাড়িটাকে ফলো করো। খুব আর্জেন্ট।

একটু রহস্যের গন্ধ পেয়ে কিষেণ আর কোনও কথা না বলে ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল। আর দূর থেকে আগের গাড়িটাকে ফলো করে এগোতে থাকল।

স্বরাজ পলকে অনিলিখা ব্যক্তিগতভাবে চেনে না। ইসরোর সঙ্গে যুক্ত নামকরা মহাকাশ বিজ্ঞানী। নামটা শোনা। পরশুদিন খবরের কাগজে ওনার একটা ছবি আর খবর ছিল। চাঁদিপুরের বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ওখানকার বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে বেরিয়েছিলেন। আর বাড়িতে ফেরেননি। কারুর সঙ্গে যোগাযোগও করেননি। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলছে। তা উনি হঠাৎ করে এখানে!

ত্রিবান্দ্রম থেকে দক্ষিণের দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি। কন্যাকুমারিকার দিকে। ত্রিবান্দ্রমের মূল শহর ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল গ্রামের পথ দিয়ে। দু-পাশে ধানখেত, নারকোল আর পাম গাছের সারি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-একটা বাড়ি। প্রত্যন্ত এলাকায় চলে এসেছে ওরা।

প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে বড় রাস্তা থেকে বাঁ-দিকে ঘুরল সামনের ইনোভা গাড়িটা। সরু পিচের রাস্তা। মিনিট দশেক বাদে একটা বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল!

কিষেণকে গাড়ি নিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়াতে বলে অনিলিখা হেঁটে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। একটু দূরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। গেটে কাউকে না দেখে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল অনিলিখা। ইনোভা গাড়িটা বাঁ-দিকে পার্ক করা আছে। চারপাশে পরপর বেশ কয়েকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কটেজ। খানিকটা এগোলে পিছনের দিকে বড় তিনতলা একটা বাড়ি। বাড়িটার দিকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল অনিলিখা। হঠাৎ চেনা গলার ডাকে ঘাড় ঘুরিয়ে চমকে উঠল অনিলিখা। রাজা। ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

—চলো অনি, এতটা যখন এসেই পড়েছ, ভেতরে এসো, এমনিতেও তোমার মতো একজনের আমাদের দরকার ছিল। আর্যভট্টর দেশের লোকেদের মাথা খুব পরিষ্কার।

অনিলিখাকে নিয়ে রাজা বাড়িটার মধ্যে ঢুকল।

ত্রিবান্দ্রম, 20 সেপ্টেম্বর—চব্বিশ দিন বাকি

অনিলিখাকে নিয়ে রাজা একটা প্যাসেজ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল। ডানদিকে সার দেওয়া ঘর। বাড়িটা বোধহয় স্কুলবিল্ডিং বা বড় সরকারি বিল্ডিং ছিল। সব ঘরের দরজায় তালা। খানিক আগে গিয়ে প্যাসেজটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। তারপর আর একটু এগিয়ে একটা বড় কাঠের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

রাজা এগিয়ে গিয়ে কাঠের দরজার হাতলের সামনে হাত রাখল। দরজাটা অদ্ভুতভাবে পাশাপাশি সরে গেল। সামনে ছোট একটা কাচে ঘেরা জায়গা। তারপরে একটা বিশাল বড় ঘর। ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ অনিলিখার মুখে কোনও কথা এল না। অবাক হয়ে অনিলিখা বলে উঠল—এখানে এসব কী? স্যাটেলাইট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার?

বিশাল ঘরটার সিলিং-এর হাইট অন্তত চল্লিশ ফুট। আর তার মধ্যে দশটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট অনায়াসে ঢুকে যায়। সারি দিয়ে পরপর কন্ট্রোল ডেস্ক। তার ওপর অত্যাধুনিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্যানেল। প্রত্যেকটাতে ডিসপ্লে, সিমুলেটর, অজানা কিছু যন্ত্র। ঘরের মধ্যে অন্তত কুড়িজন লোক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। সামনের পুরো দেওয়াল জুড়ে রাখা বিশাল এল.ই.ডি. প্যানেলে বিশাল পৃথিবীর ম্যাপ। তার মধ্যে বিশেষ কতগুলো জায়গায় লাল-হলুদ আলো দপদপ করছে।

—কী ব্যাপার রাজা? এসব কী?

—চলো ক্যাফেতে যাওয়া যাক! পাঁচ মিনিটে তোমাকে সব বলে দিই। আমার হাতেও একদম সময় নেই।

খানিকবাদে ওই বাড়িরই আরেকটা বড় ঘরে ওরা এসে ঢোকে। সার দিয়ে চা-কফির মেশিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা। চট করে মেশিন থেকে দুটো কফি নিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসে রাজা বলে উঠল,—

—আমাদের খুব বিপদ অনিলিখা। উই আর অন দ্য ভার্জ অফ এক্সটিংকশন। সারা পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা অ্যাসটেরয়েড ঠিক চব্বিশ দিন বাদে আমাদের এই পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। ভাবতে পারছ?

—সে কী! পৃথিবীতে ধাক্কা মারতে পারে এমন প্রায় সব স্যাটেলাইটকেই তো আমরা চিহ্নিত করে ফেলেছিলাম। হঠাৎ করে এই অ্যাসটেরয়েডটা এল কোত্থেকে?

—ওই, ওই যে 'প্রায়' কথাটা বললে। এক কিলোমিটারের থেকে বড় নব্বই শতাংশ পাথরকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বাকি দশ? দু-মাস আগে নিউ মেক্সিকোর এক মিটার লম্বা একটা টেলিস্কোপে যতক্ষণ না এই অ্যাসটেরয়েডটা ধরা পড়েছিল, ততক্ষণ আমরাও তোমার মতো নিশ্চিন্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম আমরা বোধহয় সব অ্যাসটেরয়েডের কথাই জানি। তারপরে হঠাৎ এই শনির উদয়। হ্যাঁ, এই অ্যাসটেরয়েডটার নাম দেওয়া হয়েছে শনি।

—তা এ ধাক্কা মারলে কী হবে?

—প্রাণের কোনও চিহ্নই থাকবে না বলতে পারো। কারণ এক কিলোমিটারের বেশি কোনও অ্যাসটেরয়েড ধাক্কা মারলে তার প্রভাব কোনও একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। হিরোশিমার মতো দশ হাজারটা পরমাণু বোমা একসঙ্গে ফাটলে যা ফল হয় তাই আর কি! ঠিক যেমন পঁয়ষট্টি লক্ষ বছর আগে ডাইনোসরদের যুগ শেষ হয়েছিল এরকমই একটা অ্যাসটেরয়েডের আঘাতে—তেমনই হতে চলেছে। এবার আমাদের পালা। ওই যে আমরা ভাবতাম আমরা খুব বুদ্ধিমান—আমরাই দু-মিলিয়ান বছর ধরে রাজত্ব করব—সব ভুল।

রাজা খানিকক্ষণ থেমে ফের উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—তবে সব কিছু এখনও শেষ হয়নি অনিলিখা। এখনও উপায় আছে। আর তাই আমরা সমবেত হয়েছি। এখানে যাদের দেখছ তারা সবাই মহাকাশ বিজ্ঞানে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে কেউ মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে মহাকাশে গেছেন, তো কেউ স্পেস ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। মহাকাশ যাত্রার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। অনেকের আবার এ বিষয়ে প্রচুর রিসার্চ আছে। এঁরা সবাই বাড়িঘর-পরিবার ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন।

—অনেককে না জানিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছ, তাই না? স্বরাজ পলের মতো?

—করতে হয়েছে অনিলিখা। মনে রেখো এ বিষয়ে পৃথিবীর সেরা মেধাকে একসঙ্গে না করতে পারলে কোনও সমাধান বেরোবে না। আর তখন এ পৃথিবীই থাকবে না। আমরা কেউ থাকব না। না থাকবে আমাদের পরিবার—না থাকবে আমাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন কেউ না! ঘটা করে ডেকে আনলে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেত না।

—কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে কি সম্ভব?

—সেটাই তো চ্যালেঞ্জ অনিলিখা। আমরা কুড়ি বছরের কাজ দু-মাসে করার চেষ্টা করছি। প্রত্যেকদিন, প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মুহূর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান। এই যে তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলছি, তারও একটা উদ্দেশ্য আছে অনিলিখা। তুমি ঠিক এ বিষয়ের না হলেও তোমার অসম্ভব ট্যালেন্ট সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো। আমরা সবাই এ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তোমার চিন্তাভাবনার খোলা হাওয়া আমাদের দরকার। তবে বাড়ির কাউকে এ ব্যাপারে জানাতে পারবে না।

—কিন্তু ওরা তো চিন্তা করবে। হয়তো পুলিশে খবর দেবে। তখন?

—ওসব চিন্তা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। আমার লজিস্টিক্স টিম সব সামলে নেবে। হয়তো অন্য কোনও কারণ জানানো হবে।

—ঠিক আছে রাজা। বাড়িতে অন্তত একটা ফোন করে দিই।

—একটাও না,—অস্বাভাবিকরকম জোরে শাসনের সুরে বলে উঠল রাজা। তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বলল,—এমনিতেও পুরো এলাকার সবরকম নেটওয়ার্ক ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। এখানে যারা আছে তারা কেউ চাইলেও এ-প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত নয় এরকম কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। এটাই এখানকার নিয়ম। ভাবতে পারছ কী হবে যদি এই অ্যাসটেরয়েডের ধাক্কার কথা বাইরে কোনওভাবে জানাজানি হয়ে যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে। আইনকানুন ভেঙে পড়বে। প্যানিক ছড়িয়ে পড়বে। আমরা আমাদের ধ্বংস আরও তাড়াতাড়ি ডেকে আনব।

অনিলিখাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রাজা ফের বলে উঠল,—আর তোমাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে আমরাই ইচ্ছে করে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। তা না হলে কারও পক্ষে এখানে ঢোকাও সম্ভব নয়—বেরোনোও সম্ভব নয়। সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেও।

—তা হঠাৎ করে এখানে? এখানে তো কোনও সুযোগ সুবিধেই নেই। অনিলিখা এতক্ষণে কফিতে চুমুক দিয়ে বলে উঠল।

—আমরাই চাইনি মূল মহাকাশ কেন্দ্রগুলোতে এ নিয়ে কাজ করতে। তাতে খবর ছড়িয়ে যেত তাড়াতাড়ি। এরকম টপ সিক্রেট প্রোজেক্টে অনেক অসুবিধে। আমরা তাই অন্য উপায় বেছে নিয়েছি। আমরা চারটে টিমে কাজ করছি। চারটে টিম চার ধরনের পদ্ধতিতে অ্যাসটেরয়েডের ধাক্কা আটকানোর চেষ্টা করছে। আমেরিকার টিমটা ফ্লোরিডায়। কেনেডি স্পেস সেন্টারের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে কাজ করছে। দ্বিতীয় টিমটা জার্মানির মিউনিখে। জার্মানির কলম্বাস কন্ট্রোল সেন্টারের কাছাকাছি একটা জায়গায় আছে। তৃতীয় টিমটা জাপানের সুকুবা স্পেস সেন্টারের কাছে অপারেট করছে। আর চতুর্থ টিম—আমরা। এখানে। বিক্রম সারাভাই স্পেস স্টেশনের কাছে।

আমরা এসব কেন্দ্র থেকে সবরকম প্রযুক্তিগত সাহায্য পাচ্ছি, আবার একইসঙ্গে গোপনীয়তাও রক্ষা হচ্ছে। কারণ আমরা কাজ করছি এসব মহাকাশ কেন্দ্রের বিশেষ কিছু লোকের সঙ্গে। আমাদের কাজটা তো রকেট তৈরি করা নয় বা লঞ্চ সেন্টার তৈরি করাও নয়। আমরা শুধু সারা বিশ্বের সবক'টা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, লঞ্চ সেন্টার আর মিশন কন্ট্রোল সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করে এই প্রোজেক্টটাকে পরিচালনা করছি।

—তা, টিমগুলো কাজ করছে কী ভাবে?

—আমেরিকার টিমটা কাজ করছে পারমাণবিক রকেটের ওপর। রকেটের সাহায্য পরমাণু বোমা ছোঁড়া হবে। প্রচণ্ড গতিতে গিয়ে ধাক্কা মারবে অ্যাসটেরয়েডকে। পৃথিবীতে ঢোকার আগেই অ্যাসটেরয়েড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এতে সমস্যা আছে। ভাঙা বড় টুকরো পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে পারে, তবে এটাই প্রধান সমস্যা নয়। সমস্যা হল এ ধরনের রকেট ছোঁড়ার অনুমতি পাওয়া। সামান্য এদিক ওদিক হলেই অন্য কোথাও গিয়ে পড়বে। আর তাতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলে যে কী হবে! সারা পৃথিবী একজোট হয়ে সম্মতি দিলে তবেই এরকম রকেট ছোঁড়া যাবে। তবে পরমাণুবোমা অন্য কোনওভাবে অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসানো যায় কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে।

—জার্মানির টিমটা?

—বুঝতেই পারছ জার্মানির টিমটা ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি আর রাশিয়ার ফেডারেল স্পেস এজেন্সির সঙ্গে মূলত কাজ করছে। ওরা সৌরশক্তি চালিত মেশিন অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে। ওপরে ওখানে তো আর সূর্যের আলোর অভাব নেই। ওই মেশিন সৌরশক্তিতে চলবে আর আস্তে আস্তে অ্যাসটেরয়েডের মুখ ঘুরিয়ে দেবে। মুশকিল হল, সময় খুব কম। এতটুকু সময়ের মধ্যে এত শক্তিশালী একটা মেশিন তৈরি করা, তাকে ঠিকভাবে অ্যাসটেরয়েডের গায়ে বসানোও চাট্টিখানি কথা নয়। পাঁচ-ছ'বছর সময় পাওয়া গেলে এভাবে কিছু করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন তো মাঝে কয়েকটা দিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজা। পাশের কাচের জানলার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, —এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে এরকম হতে পারে। আমার দু-মাস সবে বিয়ে হয়েছে। ওকেও কিছু জানাইনি। হয়তো আর দেখাও হবে না।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—তৃতীয় টিম জাপানের। ওই টিমের কাজটা খুব অভিনব। ওরা ভাবছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে একটা বড় লেন্স পাঠানোর কথা—যার সাহায্যে সৌরশক্তিকে অ্যাসটেরয়েডের ওপর ফোকাস করা হবে। এতে অ্যাসটেরয়েডের কিছু অংশ পুড়ে যাবে আর ভর কমে যাওয়ার জন্য অ্যাসটেরয়েডের গতিপথ আস্তে আস্তে পালটে যাবে। এখানে কিছুটা কাজ এগিয়েছে। তবে প্রশ্ন হল গতিপথ যতটা পালটানো যাবে তা যথেষ্ট কি না।

—আর এখানকার টিমটা?

—আমরা ভাবছি একটা মহাকাশযান পাঠাব যা ওই অ্যাসটেরয়েডের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সরাসরি অ্যাসটেরয়েডের গায়ে না বসে পাশাপাশি যাবে আর অভিকর্ষ বলের সাহায্যে অ্যাসটেরয়েডকে কাছে টেনে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

—তা তার জন্য তো বিশাল মহাকাশযান পাঠাতে হবে।

—হ্যাঁ, সেটাই তো সমস্যা। কতটা কন্ট্রোল দরকার ভাবতে পারছ? মাত্র এ-ক'দিনে কতটা সরানো যাবে সেটাই প্রশ্ন। আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব বেশি পে-লোড পাঠাবার, যাতে অভিকর্ষবল জোরদার হয়। আর যতটা সম্ভব গতিপথ পালটানো যায়। মুশকিল হল, এ পর্যন্ত মহাকাশে যত পে-লোড আমরা পাঠিয়েছি, এক্ষেত্রে দরকার হবে তার হাজারগুণ বেশি পে-লোডের। তবে সেটাও যদি কাজ না করে—

রাজা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—চলো এবার কাজে নেমে পড়া যাক। তোমার দায়িত্ব কী হবে তা বুঝিয়ে বলি। মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন। বলে রাজা অনিলিখাকে নিয়ে দ্রুতপায়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রোজেক্ট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, ত্রিবান্দ্রম, 24 সেপ্টেম্বর—কুড়ি দিন বাকি

কয়েকটা দিন ঝড়ের মতো কেটে গেল। দিনরাত কাজ চলছে। এ তো আর শুধু পরিকল্পনা আর গবেষণা নয়, সেই পরিকল্পনাকে সাকার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবস্থাও নিতে হচ্ছে।

এতগুলো স্পেস এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও একটা ব্যাপার। তার মধ্যে ইজরায়েলের স্পেস এজেন্সিও যেমন আছে, তার শত্রুদেশ ইরানের স্পেস এজেন্সিও আছে। চিনের স্পেস অর্গানাইজেশনও আছে। জাপানের এরোস্পেস এক্সপ্লারেশন এজেন্সি আছে। একই সঙ্গে সবরকম গোপনীয়তাও অবলম্বন করতে হচ্ছে। দেখা হচ্ছে কোথায় কোন লঞ্চ সেন্টার আছে, সেখান থেকে অতীতে কী ধরনের রকেট ছোঁড়া হয়েছে, তাদের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা কীরকম। সবচেয়ে বড় কী রকেট আছে—তাদের কোন উচ্চতা পর্যন্ত পাঠানোর ক্ষমতা আছে। তারপরে প্রয়োজনমতো তাদের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে।

অনিলিখা রাজাকে মূলত সাহায্য করছে পুরো প্রোজেক্টের ম্যানেজমেন্টে, নতুন চিন্তাভাবনা জোগাতে, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

রাজা সত্যিই দক্ষ প্রশাসক। এতজন নামকরা বিজ্ঞানীকে হঠাৎ এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদেরকে দিয়ে একসঙ্গে কাজ করানো সোজা কথা নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে, ইগো আছে। অনেকে এরকম টিমে কাজ করতে অভ্যস্তই নয়। তা ছাড়া নানান দেশের নানান ভাষার সমস্যা—নানানরকমের ব্যবহার—এসব সমস্যা তো আছেই; অনিলিখার সামনেই সেদিন নাসার সায়েন্টিস্ট ডক্টর স্টিভেন আর রাশিয়ান কসমোনট কোটভ ওলেগের মধ্যে কাজের পদ্ধতি নিয়ে এমন তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে, রাজা এসে মধ্যস্থতা না করলে কী হত বলা মুশকিল।

এদের মধ্যে অনেকেরই মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে। কেউ কেউ আবার মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করেছে। যেমন জাপানের ডক্টর ওয়াকাটা। ইনি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আগে কাজ করেছেন। রোবোটিক্স অপারেশনের সব দায়িত্ব পালন করেছেন। কীভাবে মহাকাশে রোবোটিক্স আর্ম ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে উনি এক্সপার্ট। আবার কারো কারো রিকের মতো বহুমুখী অভিজ্ঞতা। রিকের কথাই বলা যাক। প্রথমে স্পেস ফ্লাইটের জন্য সফটওয়্যারের ওপর কাজ করেছেন। পরে ককপিটের ডিজাইনের ওপর কাজ করেছেন। তারপর অ্যাস্ট্রনটের ট্রেনিং নিয়ে তিনটে মহাকাশ যাত্রায় মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ

করেছেন। মহাকাশে চল্লিশ দিন কাটিয়েছেন। মহাকাশে হেঁটেওছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ। না জানিয়ে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে।

যেমন মার্ক। মূলত গণিতজ্ঞ। অ্যাসটেরয়েডের কক্ষপথ গণনায় ওনার মতো এক্সপার্ট খুব কম আছে। থাকেন জোহানেসবার্গে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ওনাকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। উনি মাঝেমধ্যেই রাজার ওপর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন। তবে কাজ বন্ধ করেননি।

এসবের মধ্যেই রাজা ঠান্ডা মাথায় কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। নিয়মের কোনও নড়চড় নেই। প্রত্যেকদিন তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর কুড়ি মিনিটের জন্য টিমের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের জন্য টিম মিটিং হচ্ছে। দিনে একবার প্রত্যেকটা টিম এক ঘণ্টার জন্য অন্য টিমগুলোর সঙ্গে কথা বলছে। কোন টিম তাদের কাজে কতটা এগিয়েছে, তা অন্য টিমকে জানানো হচ্ছে। তাদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া রাজার প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট টিমের সঙ্গে নানান মহাকাশ সংস্থার কথাবার্তা চালু আছে।

রাজা অনিলিখাকে একবার বলেছিল,—প্রথমবার সারা বিশ্ব একজোটে কাজ করছে। আমি নিজেও সবার কাছ থেকে এতটা সাপোর্ট পাব তা ভাবতে পারিনি। আমরা দেশভাগ ভুলে একসঙ্গে কাজ করলে কী না পারি? তবে যাকে বলে মরণকালে হরিনাম।

অনিলিখা বলে উঠল,—কেন, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের কাজে পৃথিবীর নানান দেশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রায় গত পনেরো বছর ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারের কাজ তো এভাবে চলছে।

—সে আর ক'টা দেশ! তা-ও অনেক লিখিত অলিখিত নিয়ম আছে। বাধা নিষেধ আছে। এখানে পৃথিবীর যে-ক'টা দেশে মহাকাশ প্রযুক্তি খানিকটা এগিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। প্রথমবার সারা পৃথিবী এক আকাশের তলায়। উপায় একটা বেরোবেই।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজা।—মুশকিল একটাই। আর মোটে কুড়িদিন বাকি।

ত্রিবান্দ্রম, 26 সেপ্টেম্বর—আঠেরো দিন বাকি

—ডক্টর ন্যাশ, এ মেলটা কি আপনারই লেখা? রাজা বলে উঠল।

ডক্টর ন্যাশ ওনার ডেস্কে সিম্যুলেটর নিয়ে কী সব করছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। কাগজটা একঝলক দেখামাত্র ওনার কানদুটো লাল হয়ে উঠল। ডক্টর ন্যাশ ইংল্যান্ডের লোক। 'অ্যাসটেরয়েডরা যখন সূর্যের কাছ দিয়ে যায়, তখন তাপ গ্রহণ করে। পরে সে তাপ যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার গতিপথে সামান্য পরিবর্তন হয়।' ডক্টর ন্যাশ এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। অত্যন্ত সজ্জন, পণ্ডিত ব্যক্তি। উনিও ভারতের টিমে আছেন।



রাজা বলতে থাকে,—আপনি লিখেছেন যে আপনি অন্তত এটা দেখবেন যে অ্যাসটেরয়েডের আঘাতে ইংল্যান্ডের বড় কোনও বিপদ না হয়। এ-ও লিখেছেন যে গতিপথে সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব হলে ইংল্যান্ড বা আয়ার্ল্যান্ডের তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। অ্যাসটেরয়েড আফ্রিকার ভূখণ্ডে এসে পড়বে। রকেট ছোঁড়া সম্ভব হলে এটা আপনি নিশ্চিত করবেন। এখানে আসার আগে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সাংকেতিক মেসেজে পাঠালেও আমার উদ্ধার করতে অসুবিধে হয়নি। এই মেলটা কাকে করেছেন তা-ও আমরা জেনে গেছি। আমাদের লক্ষ্য পুরো পৃথিবীকে বাঁচানো, কোনও একটা দেশকে নয়। তাই না?

ডক্টর ন্যাশ মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

রাজা ফের বলল,—আমি এ-ও জানি যে G8-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটে দেশের শীর্ষনেতাকে দুদিন আগে আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিনে এক পাবে মাঝরাতে আলোচনা করতে দেখা গেছে—যার মূল বিষয় ছিল কীভাবে সেই তিনটে দেশকে এই অ্যাসটেরয়েডের আঘাত থেকে রক্ষা করা যায়। আমি নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে আরও কেউ আছে যার হয়তো এরকম কোনও সংকীর্ণ স্বার্থ আছে।

নাইজেরিয়ার বিজ্ঞানী ড: আজিজ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন,—এ জন্যই আমরা আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস করি না। বাকি পৃথিবীতে আর কোনও লোক বেঁচে না থাকলেও ওদের কিছু আসে যায় না।

ব্যস, পুরো ঘরে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। প্রায় মাছের বাজারের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি। কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীর অনেক চেষ্টার পরে পরিস্থিতি আয়ত্তে এল।

অনিলিখা শান্তভাবে বলতে শুরু করল,—আপনারা সবাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোক। আমিই বরঞ্চ এ বিষয়ের নই। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে এ সংঘাত হলে কোনও দেশই রক্ষা পাবে না। কিছু দেশ হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু যারা পড়ে থাকবে তাদের অবস্থা হবে আরও খারাপ। পুরো আকাশ ঢেকে যাবে ধুলোয়। মাসের পর-মাস, বছরের পর-বছর সে ধুলোর বাষ্পে ঢেকে যাবে সূর্যের আলো। থাকবে না কোনও গাছপালা, থাকবে না কোনও খাদ্য। আমরা কেউ থাকব না। আসুন, আমরা এখানে রাজনীতি থেকে দূরে থাকি। দেশের সীমারেখা ভুলে যাই। আমাদের একটাই দেশ। তা হল পৃথিবী। আমরা তাকে বাঁচাবই। এখনও আঠেরো দিন বাকি।

মিউনিখ, 30 সেপ্টেম্বর—চোদ্দো দিন বাকি

ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এ চারটে টিমেরই প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিস উপস্থিত। এরাই প্রোজেক্টের পুরো প্ল্যান নিয়ন্ত্রণ করে। জার্মান টিমের প্রধান অ্যাক্সেল ওয়াইজ ঘুম জড়ানো গলায় বলতে শুরু করলেন,—নাহ, কোনওভাবেই সম্ভব নয়। দশ বছরের কাজ কি আর দু-মাসে করা যায়! তবু আমরা হাল ছাড়িনি।

একটু থেমে ফের শুরু করলেন,—কাজাখস্তানের বৈকনুর কসমোড্রোম, ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি, মস্কোর মিশন কন্ট্রোল সেন্টার গত দেড়মাস ধরে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে গেছে আমাদের সঙ্গে। গুড নিউজ হল তার জন্য এখন আমরা একটা প্রোটন রকেট বৈকনুর কসমোড্রোম থেকে লঞ্চ করতে প্রস্তুত। তাতে আমরা রোবোটিক্স ল্যাবরেটরিও বসিয়ে দিয়েছি। সৌরশক্তি চালিত যন্ত্র রোবো দু-ঘণ্টা আগে রেডি হয়ে গেছে, যদিও তার শক্তি খুবই সীমিত। আমাদের স্পেস ট্রাভেল এক্সপার্ট থিওডরও প্রস্তুত। থিওডরের মতো স্পেস ট্রাভেলে অভিজ্ঞ কসমোনট সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে। কিন্তু এতসব করার পরেও রকেট পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না।

—কেন? অ্যাসটেরয়েডে রোবো বসাতে কোনও মুশকিল হচ্ছে? জন এদিক থেকে বলে উঠল।

—বুঝতেই পারছ সে কাজটা সোজা নয়। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল অ্যাসটেরয়েড এখন পৃথিবীর এত কাছে চলে এসেছে যে এই চোদ্দো দিনে গতিপথে যা পরিবর্তন করা যাবে, গণনা করে দেখা যাচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। দেখো—ট্র্যাজেক্টরির কতটুকু পরিবর্তন হবে—বলে অ্যাক্সেল ওখানকার কনফারেন্স রুমের ডিসপ্লেতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

—আগের গতিপথ আর নতুন পরিবর্তিত গতিপথের মধ্যে প্রায় কোনওই তফাত নেই। এমনকী পৃথিবীর যে জায়গায় অ্যাসটেরয়েড ধাক্কা মারত, তার সঙ্গে পরিবর্তিত জায়গার দূরত্ব হবে বড়জোর চারশো কিলোমিটার।

অ্যাক্সেল একটু কেশে নিয়ে ফের বলে উঠলেন,—অ্যাসটেরয়েড এখন এত কাছে এসে গেছে যে আমার মনে হয় না ইনডাইরেক্ট মেথডগুলো দিয়ে আর কোনও কাজ হবে। ওই সাইজের অ্যাসটেরয়েডকে এত কম সময়ের মধ্যে সরাতে যা শক্তির প্রয়োজন, তার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ শক্তিসম্পন্ন মেশিন পাঠানোর ক্ষমতাও আমাদের নেই। এখন উপায় সরাসরি ধাক্কা।

কায়টো টাকাহাসি জাপানের টিমের প্রধান। উনিও অ্যাক্সেলের সপক্ষে বলে উঠলেন,—আমরা জাপানে কোনও কিছু সহজে ছেড়ে দিই না। শেষ পর্যন্ত আশা রাখি। কিন্তু আমাদের টিমেরও এই ধারণা। আমাদের লেন্স তৈরির কাজ প্রায় আশি শতাংশ হয়ে গেছে। আমরা এখন থেকে ঠিক চারদিন তিন ঘণ্টার মধ্যে ওই লেন্স ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করেছি। কিন্তু ওখানে ঠিকভাবে লাগাতে, অ্যাসেম্বল করতে, লেন্সের সাহায্যে সৌরশক্তি কেন্দ্রীভূত করে অ্যাসটেরয়েডে ফেলার জন্য প্রস্তুত হতে আরও অন্তত বারো ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ, পড়ে থাকবে ন'দিন-ন'ঘণ্টা। তাতে অ্যাসটেরয়েড যতটাই ভস্মীভূত হোক না কেন—তা যথেষ্ট নয়। ওইটুকু ভর কমলে গতিপথ কিছুই পালটাবে না। আমাদের সফল হওয়ার প্রোবাবিলিটি হাজার ভাগের একভাগ।

তা ছাড়া এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্রযুক্তি পরীক্ষিত নয়। এত দ্রুত ধাবমান অ্যাসটেরয়েডের গতির সঙ্গে লেন্সের দিক পরিবর্তনের তাল মেলাতে হবে। আমারও মনে হয় আমরা আলাদা আলাদা করে চেষ্টা না করে এখন একটাই উপায় ঠিক করি। তাতে অন্তত কিছু যদি করা সম্ভব হয়।

আরও বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। একটা কথাই বোঝা গেল যে প্রত্যেকেই অসহায়। প্রত্যেকেই ভাবছে যে অন্য কেউ যদি কিছু মির‍্যাকল করে দেখায়। 'অসম্ভব' কথাটা প্রথমবার সত্যি মনে হল অনিলিখার। যত সময় যাচ্ছে একটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যেকের মধ্যে—চোখে-মুখে, হাঁটাচলায়। অনিলিখা নিজেও তার বাইরে নয়। সত্যিই কি আর চোদ্দো দিনে সব শেষ হয়ে যাবে!

ঘরে ফিরে এসে ফোনে সেভ করে রাখা আগের ছবিগুলো দেখল অনিলিখা। মা-বাবা-বন্ধুদের ছবি। আর কি কখনও দেখা হবে? ইস, কত কিছুই তো করার ছিল।

প্রোজেক্ট মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, ত্রিবান্দ্রম, 4অক্টোবর—ঠিক দশ দিন বাকি

—স্ক্রিনে বারচার্টে ফুটে উঠছে—উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের প্রস্তুতি 50 শতাংশ, রকেটের প্রস্তুতি 40 শতাংশ—কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রস্তুতি 20 শতাংশ, মহাকাশযানের মাধ্যমে অ্যাসটেরয়েডকে গতিপথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি 20 শতাংশ।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল রাজার। আর মোটে দশ দিন বাকি। বিশেষ মিটিং ডাকা হয়েছে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাজা বলতে শুরু করল,—আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর এই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সত্যিই কোনও অর্থ নেই। আমরা ব্যর্থ।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—আমাদের যে পে-লোড দরকার অ্যাসটেরয়েডকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আমরা কোনওভাবেই পাঠাতে পারব না। আমরা আমেরিকার দুটো, রাশিয়ার তিনটে, ভারত ও জাপানের একটা করে রকেট উৎক্ষেপণের জন্য রেডি করেছি। কিন্তু মুশকিল দুটো। এক, তাতেও যথেষ্ট পে-লোড পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। দুই, প্রত্যেক মহাকাশযানকে নির্ভুলভাবে অ্যাসটেরয়েডের পাশে পাশে যেতে হলে যে প্রস্তুতি দরকার তা আমাদের কোনওভাবেই নেই।

কথাটা বলে রাজা চুপ করে গেল। কনফারেন্স রুমে সম্পূর্ণ নীরবতা। আসলে কারও কিছু বলার নেই। ড: ক্রিশ্চিয়ানো বলে উঠলেন,—এখন একমাত্র ভরসা অ্যাসটেরয়েডে সরাসরি আঘাত। আমি আগেই বলেছিলাম এ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই, শুধু শুধু এতগুলো দিন নষ্ট হল!

—নষ্ট নয় ক্রিশ্চিয়ানো। আমরা যা করেছি তা সম্পূর্ণভাবে ওদের কাজে লাগবে। আমরা আমেরিকার টিমের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে কাজ করেছি। আমরা কী করছি, ওরা তা সবই জানে। ওরা অনেকটাই এগিয়েছে। আমাদের কাজ হবে আগামী কয়েকদিন ওদেরকে সবরকমভাবে সাহায্য করা। ওরাই এখন একমাত্র ভরসা। সরাসরিভাবে যদি অ্যাসটেরয়েডকে ধাক্কা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু খুব কাছে চলে এলে সেটাও করা যাবে না।

ফ্লোরিডা মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, 10 অক্টোবর—চার দিন বাকি—

ডক্টর লেনো সবাইকে শুভ সম্ভাষণ করে বলতে শুরু করলেন,—আমাদের যা কিছু করার তা পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে। গত দু-তিনদিন এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত সব বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বাকি তিনটে টিম আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছে। কিন্তু তা-ও এটা ঠিক যে আমাদের প্রস্তুতি যে অবস্থায় তাতে সরাসরি ধাক্কা মারার সম্ভাবনা এখন 1 শতাংশেরও কম।

এই দেড় কিলোমিটার ব্যাসের অ্যাসটেরয়েড আমাদের দিকে যে গতিবেগে ধেয়ে আসছে তাকে মিশাইল দিয়ে মারতে গেলে, মিশাইল এতটাই নিখুঁতভাবে ছুড়তে হবে যা এক কথায় অকল্পনীয়। সাহারা মরুভূমিতে একটা ছুটন্ত উটের পিঠের বস্তায় রাখা একটা ছুঁচকে এখান থেকে ছোঁড়া একটা আধইঞ্চির মার্বেল দিয়ে তাক করার থেকেও এ কাজ হাজারগুণ শক্ত। তাই আমরা দুটো প্ল্যান করেছি।

প্রথম প্ল্যান, আই সি বি এম মিসাইল প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা গত দেড়মাসে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের সাহায্যে এর ডিজাইনে অনেক পরিবর্তন এনেছি। এর রেঞ্জ অনেক বাড়িয়েছি। এর শক্তি, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানার ক্ষমতাও অনেক বাড়িয়েছি। এর জন্য আমরা যে রকেট দুটো তৈরি করেছি সেগুলো পাঁচটা স্টেজের। শেষ স্টেজটাকেও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শেষ স্টেজটাতে পাঁচটা ওয়ারহেড আছে, তা পাঁচটা পারমাণবিক বোমা অ্যাসটেরয়েডের ওপর নিক্ষেপ করবে। যদি একটাও লাগে তো আমরা নিশ্চিন্ত। অন্তত পুরো পাথরটা পৃথিবীতে আঘাত হানবে না। আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম নিশ্চিত করবে যে পাথরটাকে লক্ষ সীমার মধ্যে ঠিকভাবে খুঁজে না পেলে ওই পারমাণবিক ওয়ারহেডগুলো কার্যকরী হবে না। বিস্ফোরণ হবে না।

—তা আমরা কি টুকরো হয়ে যাওয়া পাথরগুলোর কথা ভেবেছি? প্রফেসার জ্যাসন ইগার ত্রিবান্দ্রম মিশন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে বলে উঠলেন।

—না প্রফেসার। ওগুলোর কথা এখন ভাবার সময় নয়। জানি ওই পাথরের গুঁড়ো অন্য ধরনের সমস্যা তৈরি করবে। আমাদের স্যাটেলাইটগুলোকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু আপাতত আমরা শুধু কিছুটা সময় পাওয়ার চেষ্টা করছি।

—কিন্তু এরকম এতগুলো নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড যুক্ত দুটো রকেট ছোড়ার অনুমতি পাওয়া তো এককথায় অসম্ভব। আমি যতদূর জানি বিভিন্ন দেশের মধ্যে চব্বিশটারও বেশি এগ্রিমেন্ট আছে এরকম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত রকেট ছোড়ার বিরুদ্ধে। পাওয়া যাবে এ পারমিশন! ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার স্টিভেন প্রশ্নটা করে।

একটু হাসলেন ডক্টর লেনো। বলে উঠলেন,—বললাম না চব্বিশ ঘণ্টা আরও সময় আছে। তার মধ্যে পরের কুড়িঘণ্টা অন্তত লাগবে উৎক্ষেপণের যাবতীয় প্রযুক্তিগত বিষয়ের প্রস্তুতি দেখতে। ওই কুড়িঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ ঘণ্টার কাজ সারতে হবে। সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে আমাদের রকেট লঞ্চ সিকুয়েন্স চালু করতে হবে। তাহলে, পড়ে রইল আধঘণ্টা। ওই আধঘণ্টায় আমরা সব দেশের সম্মতি জোগাড় করব।

বলে একটু থেমে ফের বলে উঠলেন—কিছু জিনিস কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই করতে হয়। স্পেশালি যখন তাতে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জুড়ে থাকে।

—আর দ্বিতীয় প্ল্যান?

—একটা ম্যানড স্পেসক্রাফট গিয়ে ধাক্কা মারবে পাথরটাকে।

—কে চালাবে সেই মহাকাশযান? অনিলিখা জিজ্ঞাসা করল।

—দুজন মহাকাশচারীকে আমরা নির্বাচন করেছি এর জন্য। বিখ্যাত রাশিয়ান কসমোন্যাট ওলেগ। ওলেগের মতো মহাকাশযান চালানোর অভিজ্ঞতা খুব কম লোকের আছে। তার সঙ্গে যে যাবে তাকে অনেকেই চেনে না। নাম পেড্রো। পেড্রোকে আমরা গত দেড়মাস ধরে তৈরি করেছি মহাকাশ যাত্রার জন্য। পেড্রো তার নিজের ক্ষমতায় পৃথিবীর হায়েস্ট সিকিউরিটি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির অনেক পরিচয় আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া আগে যুদ্ধবিমান চালানোর অভিজ্ঞতাও ওর আছে। তাই এ ট্রেনিং নিতে ওর কোনও অসুবিধে হয়নি।

—তা এ প্ল্যানটা কি প্রথম প্ল্যানটা ফেল করলেই নেওয়া হবে?

—হ্যাঁ, আমরা তাই ঠিক করেছি, তবে সময় এত কম যে যদি প্রথম প্ল্যান ঠিকমতো কাজ না করে তার ঠিক দু-ঘণ্টার মধ্যে এই ম্যানড স্পেসক্রাফট পাঠাতে হবে, যা সরাসরি আছড়ে পড়বে অ্যাসটেরয়েডের বুকে। আমরা পরের চব্বিশ ঘণ্টায় প্রতি ঘণ্টার প্রগ্রেস জানাব। পুরো পৃথিবীর ভাগ্য ঠিক হবে আমাদের হাতে আগামী কয়েক ঘণ্টায়। আপনাদের সবার সম্পূর্ণ সাহায্য যেন আমি পাই।

বলে লেনো ভিডিয়ো কনফারেন্সিং শেষ করলেন। প্রত্যেকে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

10 অক্টোবর, বিবিসি ব্রেকিং নিউজ :
লাইভ ফ্রম বৈকনুর কসমোড্রোম, কাজাখস্তান

খানিক আগেই আমাদের কাছে খবর এসেছে পৃথিবীর দুটো রকেট লঞ্চ সেন্টার থেকে অভূতপূর্বভাবে একইসঙ্গে দুটো রকেট পাঠানো হচ্ছে। কী কারণে তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের করেসপন্ডেন্ট পেট্রোভা বৈকনুর থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে। ওভার টু ইউ পেট্রোভা।

—আমাদের সঙ্গে আছে এ প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রাশিয়ার মস্কো মিশন কন্ট্রোল সেন্টারের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার—ওলেগ।... ওলেগ, হঠাৎ করে এভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রকেট ছোড়া, —আপনি কী বলবেন এ ব্যাপারে?

—না, এটা যুদ্ধকালীন তৎপরতা নয়। আমরা জানি যে বড় কোনও অ্যাসটেরয়েড কোনও না-কোনও সময়ে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। তাই আমরা দেখতে চাই যে বাইরে থেকে কোনও অ্যাসটেরয়েড পৃথিবীর দিকে ছুটে এলে আমরা একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আঘাত করার ক্ষমতা রাখি কিনা। এজন্যই আমরা দুটো জায়গা থেকে দুটো রকেট পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছি।

—তা এরকম কোনও পাথরের পৃথিবীতে আঘাত করার সম্ভাবনা কি আপনারা দেখছেন?

—না, একেবারেই নয়, অন্তত আগামী একশো বছরে তো নয়ই। তবে আমরা যদি এখন থেকে মোকাবিলার প্রস্তুতি না নিই যখন দরকার হবে, তখন আমরা কিছুই করতে পারব না।

—তা, প্রশ্ন উঠছে যে এত গোপনীয়তার সঙ্গে এ প্রোজেক্ট করা হল কেন? এমনকী মস্কো মিশন কন্ট্রোল সেন্টারেরও বেশিরভাগই নাকি এ প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানত না।

—দেখুন, এই প্রথমবার আমরা অনেকগুলো দেশ মিলে এ ধরনের রিসার্চ প্রোজেক্টে কাজ করছি। এতগুলো স্পেস এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় একটা খুব দরকারি জিনিস। একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ রাখতে হয়েছে যে আমরা যেন অহেতুক মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ না করি। অন্য প্রোজেক্টগুলোর কাজেও যেন কোনও ব্যাঘাত না তৈরি করি, তাই।

একটু হেসে পেট্রোভা বলে উঠল,—তা আপনি যদি আমাদের দর্শকদের একটু বুঝিয়ে বলেন যে আপনারা ঠিক কী করতে চলেছেন।

ওলেগ বলতে শুরু করলেন,—খুব সংক্ষেপে বলছি। আমরা মাল্টিস্টেজ রকেটের সাহায্যে তৈরি মিসাইলের মাধ্যমে দেখতে চাইছি, বিভিন্ন রকেট থেকে একই লক্ষ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দরকার হলে আমরা তা করতে পারি কি না। তা এক্ষেত্রে তো সত্যি কোনও পাথর নেই, তাই আমরা নজর রাখব ওদের গাইড্যান্স সিস্টেম কতটা নিখুঁতভাবে কাজ করে তার ওপর। একটা কল্পিত টার্গেটের কত কাছে আমরা কোনও মিসাইল ছুঁড়তে পারি—এ তারই পরীক্ষা।

—তা এটা কি ট্যাক্সপেয়ারদের টাকা নষ্ট করা নয়? শুধু শুধু কবে একটা পাথর আসতে পারে তা ভেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

ওলেগ হেসে বললেন—তা সে তো মানুষের চাঁদে যাওয়াও পয়সা নষ্ট ছিল। তাই না?...ওলেগ বলতে থাকেন।

মিশন কন্ট্রোল সেন্টার, ত্রিবান্দ্রম, 11 অক্টোবর সন্ধে ছ'টা, তিন দিন বাকি

অবশেষে যুদ্ধ শুরু। কনফারেন্স রুমে সবার নজর সামনের মনিটরে। নয়তো দেওয়ালের ডিসপ্লেতে, মাঝেমধ্যে নোটস নেওয়ার জন্য পাতা ওলটানোর শব্দ। আর রকেট লঞ্চের অ্যানাউন্সমেন্ট। সামনের বিশাল ডিসপ্লেতে দুটো রকেটের লঞ্চ সিকুয়েন্স দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে স্ক্রিনের কোণে দেখানো হচ্ছে টেলিস্কোপ থেকে পাঠানো ধাবমান অ্যাসটেরয়েডের ছবি।

একই সঙ্গে দুটো রকেট ছোড়া হচ্ছে। একটা আমেরিকার ফ্লোরিডার কেপ কার্নিভাল থেকে। অন্যটা কাজাখস্তানের বৈকনুর কসমোড্রোম থেকে। লক্ষ্য এক—ওই অ্যাসটেরয়েড। দুটো থেকেই শেষ স্টেজে বেরিয়ে আসবে পরমাণু ওয়ারহেড, যা গিয়ে ধাক্কা মারবে অ্যাসটেরয়েডকে।

কেপ কার্নিভাল থেকে ছাড়া হবে বিশেষভাবে প্রস্তুত ডেল্টা রকেট —যার পরমাণু ক্ষেপনাস্ত্র ছোড়ার ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে বৈকনুর থেকে ছোড়া হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি একটা প্রোটন রকেট।

দুটো রকেট উৎক্ষেপণের টেকনিকাল ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে আট ঘণ্টা আগে। তবে কোনও সরকারি অনুমোদন নেওয়া হয়নি। সেটা নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি। তিনঘণ্টা আগে লঞ্চ সিকুয়েন্স চালু করা হয়েছে।

অনিলিখা আর এখানকার বাকি বিজ্ঞানীদের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। পুরো উৎক্ষেপণটাই এখন দুটো জায়গার মিশন কন্ট্রোল সেন্টারের হাতে। এখানে সবাই শুধু দেখছে রকেট উৎক্ষেপণের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। মূলত দর্শকের ভূমিকায় হলেও দরকার মতো এখান থেকেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রত্যেকের মধ্যেই অস্থিরতা, প্রত্যেকের মধ্যেই টেনশন। পাশেই টেবিলে কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু হুঁশ নেই। এতটাই মন দিয়ে সবাই লঞ্চ সিকুয়েন্স দেখছেন।

অনিলিখা দেখল যে একমাত্র মার্ক খুব উদাসীনভাবে পাতায় কীসব হিজিবিজি লিখে যাচ্ছেন। কাল মার্ক আর রাজার মধ্যে ক্যাফেতে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। মার্ক যে-কোনওভাবে বাড়ি যেতে চান, অসুস্থ ছেলেকে দেখার জন্য। পরশুদিন নাকি কমপ্লেক্স থেকে বেরোনোর ও চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। সিকিউরিটি ধরে ফেলে। মার্ক আঙুল তুলে উত্তেজিতভাবে কীসব বলছিলেন রাজাকে। কাছে গিয়ে না শুনলেও তা যে ওই প্রসঙ্গেই কিছু, তা নিয়ে সন্দেহ নেই অনিলিখার।

অনিলিখা আগে একবার রাজাকে বলেছিল মার্ককে বাড়িতে যেতে দেওয়ার জন্য। রাজা কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল,—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না অনি। এমনিতেও যা শুনেছি ছেলেটা দু-একদিনে মারা যাবে। গিয়ে কী লাভ! অ্যাসটেরয়েডের কথা বাইরে গিয়ে মিডিয়াকে জানালে কী হবে ভেবেছ? আর সেটা উনি জানাবেনই।

মার্কের চিন্তা ছেড়ে সামনের স্ক্রিনে চোখ রাখল অনিলিখা। উৎক্ষেপণ ঠিক দু-মিনিট বাকি।

অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে—

T-2 মিনিট—রিপোর্ট রেঞ্জ স্ট্যাটাস।

অন্য একটা গলায় শোনা গেল—রেঞ্জ গ্রিন, হাইড্রলিক প্রেশার 4000।

T-90 সেকেন্ড—লিক্যুইড অক্সিজেন ট্যাঙ্ক টু ফ্লাইট প্রেশার।

T-80সেকেন্ড—ফার্স্ট স্টেজ লিক্যুইড অক্সিজেন 100 পার্সেন্ট।

T-60 সেকেন্ড—লঞ্চ এনেবেলড সুইচ 'অন' পজিশন।

একটা অজানা উত্তেজনায় অনিলিখার সারা শরীর যেন শিহরিত হয়ে উঠল। মানবসভ্যতার সব আশা ভরসা এই রকেটের ওপরে। এ-দুটো রকেট পাঠাবার পিছনে অনিলিখারও অনেক অবদান আছে। ঠিক বা ভুল—দুটোতেই ওর দায়িত্ব আছে।

T-30 সেকেন্ড—ড্রেন ভালব ক্লোজড।

T-20 সেকেন্ড—ফ্লাইট লক ইন।

T-10 সেকেন্ড—আর্থ লঞ্চ ভেহিকল ইগনিশান সিস্টেম—প্রোসিড ইগনিশান।

T-7 সেকেন্ড—মেন ইঞ্জিন স্টার্ট।

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0—প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে ডেল্টা রকেট মাটি ছেড়ে মহাকাশের দিকে ছুটতে শুরু করল। পুরো লঞ্চ সাইট ঢাকা পড়ে গেছে ব্লাস্টের আগুনে। ডেল্টা আমেরিকার মাটি ছাড়ার ঠিক 8 সেকেন্ড বাদে কাজাখস্তানের মাটি ছাড়ল প্রোটন রকেট—মানুষ বিপদে পড়লে যে দেশভাগ ভুলতে পারে, তারই প্রমাণ রেখে।

মনিটরে এক অক্ষে সময়, অন্য অক্ষে রকেটের গতিবেগ, উচ্চতা আর উৎক্ষেপণস্থল থেকে দূরত্ব দেখানো হচ্ছে। বড় স্ক্রিনে একই সঙ্গে দুটো রকেটকে দেখানো হচ্ছে। ডেল্টা আর প্রোটন মিশন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে দুটো উৎক্ষেপণের ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। টেকনিকাল ভাষায়।

1 মিনিট 20 সেকেন্ড—8 নটিক্যাল মাইল উচ্চতা, বেগ 5000 মাইল প্রতি ঘণ্টা, চেম্বার প্রেশার ঠিক আছে।

1 মিনিট 40 সেকেন্ড—12 নটিকাল মাইল উচ্চতা, বেগ 7600 মাইল প্রতি ঘণ্টা। ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ খুব ভালো দেখাচ্ছে।

3 মিনিট 30 সেকেন্ড—ইগনিশন অন সেকেন্ড স্টেজ। গুড স্টেবল বার্ন। ফার্স্ট স্টেজ সেপারেশন।

4 মিনিট 30 সেকেন্ড—53 নটিকাল মাইল উচ্চতা, গুড ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইন সেকেন্ড স্টেজ। চেম্বার প্রেশার লুকস গুড।

রকেট যত এগোচ্ছে সে তার আগের স্টেজকে ফেলে পরবর্তী স্টেজগুলো নিয়ে আর আরও কম জ্বালানি নিয়ে গতিপথ অনুযায়ী ছুটে চলেছে। প্রত্যেকটা স্টেজেরই আলাদা আলাদা মোটর, আলাদা গাইড্যান্স সিস্টেম।

অনিলিখা টেকনিকাল অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে বুঝছে যে নিখুঁতভাবে ঠিক পরিকল্পিত গতিপথেই দুটো রকেট এগিয়ে চলেছে।

পনেরো মিনিটের মাথায় অভীষ্ট অ্যানাউন্সমেন্টটা হল।

—নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড লঞ্চড সাকসেসফুলি।

হাততালির ধ্বনিতে ঘর প্লাবিত হল। পরমাণুবোমা যে কখনও এত আনন্দ দিতে পারে তা কনফারেন্স রুমের অবস্থা না দেখলে ভাবা যেত না। সব বিজ্ঞানীরা উঠে দাঁড়িয়ে একে অপরকে কনগ্রেচুলেট করছে। মিশন কন্ট্রোল সেন্টার গুলোতেও একই অবস্থা। আনন্দের সব বাঁধন খুলে গেছে। এ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সবাই জানে যে এ মিশনের গুরুত্ব অন্যরকম। এ এক নতুন ভোরের সন্ধান।

রাজা এবার সত্যি কথাটা মনে করাল সবাইকে।

—আমরা কিন্তু এখনও জানি না ওই মিসাইলগুলো অ্যাসটেরয়েডকে ধাক্কা মারবে কিনা। সেটা আমরা জানতে পারব আরও এক ঘণ্টা বাদে। তবে হ্যাঁ, আমাদের দুটো রকেটকেই নির্ভুল লক্ষ্যে ছোঁড়া হয়েছে। যতটা সতর্কতা নেওয়া সম্ভব, আমরা নিয়েছি। বাকিটা ভাগ্য।

11 অক্টোবর, রাত 10টা

কনফারেন্স রুমে পিন ড্রপ সাইলেন্স। এ নিস্তব্ধতা অন্য ধরনের। যখন কেউ জানে মৃত্যু অবধারিত—তাকে কোনওভাবে এড়ানোর উপায় নেই, তখন বোধহয় এরকম স্তব্ধতাই নেমে আসে। সবার মুখে-চোখে হতাশা। আর কোনও আশা নেই। খানিক আগেই খবর এসেছে যে ডক্টর লেনো আত্মহত্যা করেছেন। ডেল্টা, প্রোটন দুটো মিশনই ব্যর্থ হয়েছে। পরমাণু বোমা অ্যাসটেরয়েডের ধারেকাছে দিয়েও যায়নি। এখনও টেলিস্কোপে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অ্যাসটেরয়েডের দাপুটে চেহারা! সে কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। আর মোটে তিনদিন বাকি। তারপর সব শেষ।

ব্যাক আপ প্ল্যানও কাজ করেনি। ওলেগ আর পেড্রোর মহাকাশযান দু-ঘণ্টা বাদে পাঠানো হয়েছিল। সেটাও অ্যাসটেরয়েডকে ছুঁতে পারেনি। ওই মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগও শেষ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদের আত্মত্যাগ বৃথা। অবশ্য শুধু ওরা নয়, সবারই একই অবস্থা হবে। শুধু কয়েকঘণ্টা কমবেশি আর কি। বিজ্ঞানীদের হাতে যে-ক'টা উপায় ছিল, সবক'টাই ব্যর্থ।

এর মধ্যে এখনও বোধহয় ড: জ্যাসন ইগার আশা ছাড়েননি কিংবা বরাবরের মতো উনি এখনও ওনার অঙ্ক ঠিক মিলেছে কিনা তা দেখে যাচ্ছেন। গতিপথটা মনিটরে দেখে খাতায় কীসব অঙ্ক কষে যাচ্ছেন। আর মাঝেমধ্যে মাথা নাড়ছেন।

স্টিভেন বলে উঠলেন,—আর তো কোনও আশা নেই। এবার আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হোক।

ওয়াকাটাও তার সপক্ষে বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, আমিও চাই শেষ মুহূর্ত আমার পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাতে। আমাকে যেভাবে হঠাৎ করে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাতে ওরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় আছে। আমি এক্ষুনি ওসাকায় ফিরতে চাই।

সবারই একই মত। সবাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে চায়। রাজা সবাইকে আশ্বস্ত করে বলে উঠল,—আপনারা নিশ্চিন্ত হন। আমি কালকে সকালেই সবার ফেরার ব্যবস্থা করব। নিশ্চিত করব যাতে শেষ মুহূর্তে

আপনারা আপনজনের সঙ্গে থাকতে পারেন। আপনাদেরও যেমন তাড়া আছে, তেমন আমারও তাড়া আছে। তবে তার আগে একটা খুব দরকারি কথা বলতে চাই। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে। অ্যাসটেরয়েড যে ধাক্কা মারবে—এটাই এখন নিয়তি। আমরা হয়তো থাকব না। কিন্তু মানবজাতি যাতে চিরতরে মুছে না যায় তার একটা উপায় আছে।

—সে আবার কী করে সম্ভব? স্বরাজবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি। কথাটা খুবই গোপনীয়। এ কথা আমি আমার বাবার কাছ থেকে ওনার মৃত্যুর কিছুদিন আগে শুনি। আমি আজীবন এ কথা গোপন রাখব—এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আজ নিতান্ত বাধ্য হয়ে এ কথা বলছি।

আজ থেকে পঁচাত্তর হাজার বছর আগে সুমাত্রার টোবা এলাকায় একটা ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। গত কুড়ি লক্ষ বছরের মধ্যে এটাই ছিল সবথেকে বড়। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পুরু ছাই-এর আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়। সব গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়। বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইডে বাতাস ভরে যায়।

ড: আজিজ একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন,—তা এখন এসব শুনে কী লাভ?

—আমাকে পুরোটা বলতে দিন, বুঝতে পারবেন। আজ থেকে ঠিক আশি হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ হোমো স্যাপিয়েন্সরা প্রথম আফ্রিকার বাইরে পা রাখে। আফ্রিকা আর আরব দেশের মাঝখানে রেড সি। মোটে এগারো কিলোমিটার সমুদ্র দূরত্ব পেরোলেই আরব। কিন্তু এর আগে কখনও মানুষ এইটুকু দূরত্বও পেরোয়নি।

'গেট অফ গ্রিফ' বলে পরিচিত ওই পথ পেরিয়ে কুড়ি-বাইশজনের দু:সাহসী একটা দল আরব দুনিয়ায় প্রথমবার প্রবেশ করে। তারপরে খাবারের সন্ধানে ও আরও ভালো জীবনের খোঁজে আজকের ইয়েমেন, ওমান, পাকিস্তানের সমুদ্রতীর বরাবর হেঁটে ভারতে প্রবেশ করে। ভারত থেকে বার্মা, থাইল্যান্ড, ম্যালেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালি, টিমোর ও আরও ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে এরা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছোয়। আর এই পথটা যেতে কয়েক হাজার বছর আর বেশ কয়েকটা প্রজন্ম লেগেছিল।

পঁচাত্তর হাজার বছর আগে সুমাত্রায় যখন অগ্ন্যুৎপাত হয়, তখন এদের ছোট একটা অংশ সুমাত্রা পেরিয়ে গেলেও ওদের বড় অংশটা সুমাত্রা আর ভারতে ছিল। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠায় তাদের প্রায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। হাতে গোনা সামান্য যে-ক'জন বেঁচে রইল তারা আশ্রয় নিল পাহাড়ের গুহায়—সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড আর অ্যাসিড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য।

কিন্তু গুহাতে লুকোলেই তো আর বাঁচা যায় না। খাবার চাই। খাবার আসবে কোথা থেকে? চারদিকে যেদিকেই যাও, হাজার হাজার মাইল তখন ছাই-এ ঢাকা, একইসঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা কমে গেছে বেশ কয়েক ডিগ্রি। ফসল, উদ্ভিদ সব নষ্ট হয়ে গেছে।

অনিলিখা যোগ করল,—প্রথমে তাই সব তৃণভোজী প্রাণীরা মারা গেল। তারপর মারা গেল তাদের খেয়ে বেঁচে থাকে যারা, সেই সব মাংসাশী প্রাণীরাও। পুরো ফুড চেনই ইমপ্যাক্টেড। পড়েছি যে কয়েক বছরের মধ্যে সুমাত্রা, ওই এলাকার সব দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, প্রায় পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রাণের কোনও চিহ্ন ছিল না। মানবজাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। পুরো এশিয়াতে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বেঁচে রইল আরশোলা, ব্যাঙের মতো কিছু প্রাণী।

—আর কয়েকজন মানুষ যারা অত সহজে হার মানতে শেখেনি। কথার খেই ধরে রাজা বলে উঠল।

অনিলিখা বলে উঠল,—তাই? কী করে জানলে?

—আজও ওদের বংশধরেরা সুমাত্রায় বেঁচে আছে। ভাবতে পারো তাদের জিনে কী অসম্ভব লড়াকু ক্ষমতা! শুধু যে তারা পায়ে হেঁটে, কাঠের ভেলায় সমুদ্র পেরিয়ে, শ্বাপদ জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে সুমাত্রায় পৌঁছেছিল তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে বড় ভলকানিক ইরাপশনের মধ্যেও লড়াই করে বেঁচেছিল।

—তুমি সুমাত্রার কোন আদিবাসীদের কথা বলছ? শুনেছি ওখানে 'বাটাক' বলে এক সম্প্রদায় আছে যারা একশো বছর আগেও মানুষ খেকো ছিল। ডক্টর ন্যাশ বলে ওঠেন।

—না, আমি যাদের কথা বলছি, তাদের কথা পুরো পৃথিবীর কাছেই অজানা। গেউরেদঙ পাহাড়ের গভীর গুহায় তাদের বাস। চারদিকে সুমাত্রার গভীর রেনফরেস্ট—পৃথিবীর সব থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এটা একটা। আধুনিক মানুষের যাতায়াত এ অঞ্চলে নেই বললেই চলে। শুধু যায় চোরা কাঠের ব্যবসায়ীরা। তা, তারাও কখনও এদেরকে দেখেনি। হয়তো এদের অদ্ভুত জীবনযাত্রার জন্য।

—এরা কি নিশাচর? অনিলিখা জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক ধরেছ অনি। গুহার অন্ধকারে এরা হাজার হাজার বছর কাটিয়েছে। ধুলোয় ঢাকা পৃথিবীতে তখন আলোর প্রবেশও নিষিদ্ধ। আগুনের ব্যবহারও এরা শেখেনি। অভিযোজনের জন্য এখন এরা পুরোপুরি নিশাচর। রাতের বেলা স্পষ্ট দেখতে পায়। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। খাবার অভ্যাসও অদ্ভুত। পোকামাকড়, আরশোলা, ব্যাং, সাপ—এই হল এদের প্রধান খাদ্য। হবেই তো। হাজার হাজার বছর ধরে এরা ছাইয়ে ঢাকা পৃথিবীতে স্বাভাবিক খাদ্য খুঁজে পায়নি। আর এরা মেয়েদের পুজো করে। কেন জানি না।

—তা রাজা, তুমি এদের কথা বলছ কেন? তুমি কি এদের মাধ্যমে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভাবছ? ডক্টর জ্যাসন ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। সুমাত্রায় আগ্নেয়গিরির পরবর্তী অবস্থা আর অ্যাসটেরয়েড সংঘর্ষের পরে পৃথিবীর যে অবস্থা হবে—তার মধ্যে অনেক মিল। ধুলোর মেঘে আটকে যাবে সূর্যের আলো। সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র শীতের আবির্ভাব হবে। সূর্যের আলোর অভাবে হারিয়ে যাবে যাবতীয় উদ্ভিজ্জ। মারা যাবে সব শাকাহারী জীব। শুরু হবে অ্যাসিড বৃষ্টি। মিলিয়ে দেখুন সুমাত্রার আগ্নেয়গিরি আর অ্যাসটেরয়েডের সংঘাতের পরের ছবি। একই ছবি দেখতে পাবেন। তাই এ ধরনের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে শুধু ওরাই। আর এরা যেরকম খায়, তাতে খাবারেরও কোনও অসুবিধে হবে না। মানবজাতিকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তো সে স্বপ্নকে সাকার করতে পারে একমাত্র এরাই।

—তুমি কী বলছ রাজা! আমাদের প্রতিনিধি হবে একটা অসভ্য, অনুন্নত উপজাতি—যারা গত আশি হাজার বছরে কোনও সভ্যতার আলো দেখেনি! যাদের মধ্যে না আছে শিক্ষা-দীক্ষা, না আছে মানুষের কোনও হাবভাব—। ডক্টর ন্যাশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন।

রাজা উত্তেজিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় বলে উঠল,—উপায়? আর তা ছাড়া আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা সবাই এদেরই বংশধর। পরবর্তী সময়ে এরাই আবার আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অনুন্নত কাদের বলছেন? জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ে এরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। এরা আশি হাজার বছর ধরে পরিবেশকে হার মানিয়েছে। জেনেটিক বিচারে এদের রক্ত আমাদের থেকে অনেক বেশি শুদ্ধ। এদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও আমাদের থেকে অনেক বেশি।

একটু থেমে রাজা ফের বলে উঠল,—আরেকটা কথাও বলি। গত দশ বছর ধরে পৃথিবীর কিছু ল্যাবরেটরিতে আমরা এদের জিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলাম। খুবই গোপনীয় ভাবে। দেখছিলাম কীভাবে এদের জিন থেকে ভালো কিছু গুণ নিয়ে জিনথেরাপির মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতা আরও বাড়ানো যায়। ভাগ্যক্রমে ঠিক এক মাস আগে আমরা এতে সফল হই। ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর আমরা এ পরীক্ষা করছিলাম। বড়দের নিয়ে এ কাজ করা অনেক শক্ত। তাই শুধু এরা নয়, এদের সঙ্গে এই পরিবেশে বাঁচার ক্ষমতা পেয়েছে বেশ কিছু ছোট বাচ্চা—যারা হবে ভবিষ্যতে মানবসভ্যতার প্রতিনিধি। আমাদের মানবসভ্যতা সৌরজগতের একমাত্র সভ্যতা, হয়তো পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যেই। তাকে এত সহজে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

—অসাধারণ আইডিয়া রাজা। কিন্তু তুমি খবরটা এত গোপন করে রেখেছ কেন? এ তো আমরা সারা বিশ্বকে জানাতে পারি। বিজ্ঞানী ওয়াকাটা উত্তেজিত হয়ে রাজার হাত ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন।

—অবশ্যই জানানো হবে। তবে এখনও সে সময় আসেনি। এরা যতবারই গুহা ছেড়ে বেরিয়েছে, আমরা অকারণে এদের পশুর মতো শিকার করেছি। আমি চাই না এ খবর নিয়ে কোনও ধরনের আলোড়ন হোক, জানাজানি হোক আর আমরা এদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলি।

রাজা এবার খানিকটা হালকা মুডে সবার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। অনিলিখাকে দেখিয়ে বলে উঠল,—দেখুন, আপনারা সব মনমরা হয়ে বসে আছেন, আর অনিকে দেখুন! এরমধ্যেও একটা ভারি সুন্দর শাড়ি পরে সেজেগুজে এসেছে। এটাই হল স্পিরিট। কখনও ওকে দেখেছেন মনমরা হয়ে বসে থাকতে! ও হারতে জানে না। ওকে দেখলেই মনে হয় এখনও আশা আছে।

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—হ্যাঁ, নতুন শাড়িটা তো আর পরার সুযোগ নাও হতে পারে, তাই পরে চলে এলাম। তবে তোমার কথা শুনে সত্যিই স্বস্তি পেলাম। তা ওই বাচ্চাগুলো এখন কোথায় আছে?

রাজা অনিলিখাকে বোঝাতে এগিয়ে গেল।

মিশন কন্ট্রোল সেন্টার ত্রিবান্দ্রম, 12 অক্টোবর

ভোর চারটে। অনিলিখার ঘরের ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। প্রথমবার ধরতে-না-ধরতেই কেটে গেল। আবার রিং। এবার ধরতেই উলটোদিকে রাজার গলা। জরুরি মিটিং। এখনই সবাইকে কনফারেন্স রুমে চলে আসতে হবে।

অনিলিখার শুতে কাল অনেক রাত হয়েছিল। এই দু-দিনের মধ্যে অনেক কিছু করার আছে। সেটারই প্ল্যান করছিল অনিলিখা। দু:স্থ ছাত্রদের একটা সংস্থার সঙ্গে অনিলিখা বহুদিন যুক্ত। এই দুদিনের মধ্যে ওদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটানোর ইচ্ছে আছে। কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটা অনাথ আশ্রমে অনিলিখা প্রায়ই যায়। ওদের গান, কবিতা আবৃত্তি শেখায়। ওদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক করাবে বলে শেষবার কথা দিয়ে এসেছিল। কথা দিয়ে কথার খেলাপ অনিলিখা কখনও করে না। তা সময় হবে কি ওদেরকে দিয়ে নাটকটা করানোর? আরও অনেক অনেক কিছু করার ছিল। বহুদিন ধরে ওর ইচ্ছে ছিল প্লেন চালাতে শেখার। এসব এলোপাথাড়ি চিন্তা সামলে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। তারপরে ঘুমের অকাল বিয়োগ ঘটিয়ে এই ফোন।

কোনওরকমে প্রস্তুত হয়ে কনফারেন্স রুমে আসতে অনিলিখার মিনিট পাঁচেক লাগল। আরও দু-তিন মিনিটের মধ্যে সবাই এসে গেল। রাজা বলতে শুরু করল—

—একটা খুবই আনন্দের খবর আছে। অ্যাসটেরয়েডের সংঘাত হচ্ছে না। আমরা এ যাত্রায় বেঁচে গেছি।

—কী করে!

—সেটা বলছি। তবে ধাক্কা যে লাগছে না, তা নিশ্চিত।

—হচ্ছে না! প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ স্কুলছুটি হলে বাচ্চাদের যেরকম হয়! এ ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরছে। ডক্টর আজিজ আবার নাচতে শুরু করে দিলেন। স্বরাজবাবুও তাতে যোগ দিলেন। শুধু ডক্টর জ্যাসন বোধহয় আগেই জানতেন। উনি সেরকম অবাক হয়েছেন বলে অনিলিখার মনে হল না।

রাজা বলল,—ডক্টর জ্যাসন, আপনিই এ ব্যাপারটা সবাইকে বিস্তারিত বলুন। আপনার জন্যই এ কথা জানতে পেরেছি, একটু দেরিতে যদিও।

ডক্টর জ্যাসন বলতে শুরু করলেন,—আমার প্রথম সন্দেহ হয় তখনই, যখন দেখি আমাদের পাঠানো তিন-তিনটে রকেটই ব্যর্থ হয়েছে। আমার চোখে পড়ে অ্যাসটেরয়েডের কক্ষপথ যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমি ও মার্ক গতকাল অনেকক্ষণ ধরে এটা নিয়ে পর্যালোচনা করি। খুব জটিল গণনা। কাল রাত

বারোটা নাগাদ নিশ্চিত হই। দেখি, আমাদের ধারণা ঠিক। উর্ট বলয়ের একটা কমেটই এই বিচ্যুতির কারণ। কালকে ওই কমেটের নিউক্লিয়াস আর ওই অ্যাসটেরয়েড পরস্পরের কাছ দিয়ে যায়। আর তারই জন্য অ্যাসটেরয়েডের গতিপথের হঠাৎ এই পরিবর্তন। ওই কমেটকে ধন্যবাদ—এই মহাবিশ্বের নিয়ন্তাকে ধন্যবাদ—অনেক অনেক ধন্যবাদ, উনি আমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে আমরা কতটা অসহায়। নাউ এনজয়! শ্যাম্পেনের বোতলটা ওপরের দিকে তুলে ধরে ডক্টর জ্যাসন শেষ করলেন।

ডক্টর জ্যাসনের কথা শোনার ধৈর্যও এখন আমাদের নেই। এ-ক'টা দিন যা টেনশনে কেটেছে! কে কবে দেশে ফিরবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এরমধ্যে রাজা সবাইকে চুপ করার অনুরোধ করে বলতে শুরু করল।

—আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে সুজাক উপজাতি দেখাতে অনুরোধ করেছেন। 'সুজাক' নামটা আমারই দেওয়া। এখান থেকে সুমাত্রা দূর নয়। আমি চার্টার্ড প্লেনের ব্যবস্থা করেছি। এখান থেকে সুমাত্রার মেডান পর্যন্ত চার্টার্ড প্লেনে যাব। তারপরে সেখান থেকে গাড়িতে। ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনওরকম চিন্তা করবেন না। দুদিনের মধ্যে ফিরে এসে আমরা যে যার দেশে ফিরে যেতে পারি। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে জোরাজোরি করব না। যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরাই যাবেন। তবে এটুকুই বলব যে যাঁরা যাবেন না, তাঁরা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম মানুষ দেখার এক অসাধারণ সুযোগ হারাবেন। এ সুযোগ বারবার আসবে না।

সবাই একবাক্যে রাজি। এরকম সুযোগ কে হাতছাড়া করে! সারা পৃথিবী এখন এদের কথা জানে না। তা ছাড়া সুমাত্রার আকর্ষণ! যার আগের নাম ছিল স্বর্ণদ্বীপ। সুমাত্রার বন-জঙ্গল-পাহাড়—তার আকর্ষণই বা কম কীসের?

রাজা আবার বলতে শুরু করল,—তবে একটা শর্ত আছে। ফেরার আগে অবধি কেউ সুজাক উপজাতির কথা কাউকে জানাতে পারবে না। নো ফোন-ক্যামেরা-ল্যাপটপ-আইপ্যাড। এসব কোনও কিছু নিতে দেওয়া হবে না। আর আমরা ফিরে এসেই একেবারে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক?

কিছু বিরোধিতা ছিল, তবে শেষে সবাই এ শর্ত মেনে নিল। ঠিক হল দুপুর বারোটায় সুমাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া হবে। রাজা এইটুকু সময়ের মধ্যেই সবকিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

এতক্ষণে অনিলিখা লক্ষ করল যে কনফারেন্স রুমে সবাই আছে, শুধু মার্ক নেই, রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মার্ককে দেখছি না, মার্ক কোথায়?

রাজার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

—কাল রাতে ওর ছেলে মারা গেছে, ওকে আমি তাই আজ সকালে যেতে দিয়েছি। এই খানিক আগেই চলে গেলেন।

—খুব অন্যায় করেছ রাজা। ওনাকে এভাবে আটকে রাখা একদম উচিত হয়নি। অন্তত মৃত্যুকালে তো উনি ছেলের সঙ্গে থাকতে পারতেন।

রাজা কোনও কথা বলল না, চুপ করে রইল।

কনফারেন্স রুম থেকে নিজের ঘরে ফেরার সময় অনিলিখা মার্কের রুমে একবার উঁকি মারল। ঘর ফাঁকা, লাগেজ, জামাকাপড় কিছু নেই। মার্কের সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল অনিলিখার। খুব ভালো লোক বলে মনে হয়েছিল মার্ককে। ছেলের জন্য খুব চিন্তায় ছিলেন। ঘর যেরকম পরিষ্কার, তাতে মনে হল না যে মার্ক খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছেন। বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ির মধ্যে শুধু একটা কাগজ পড়ে আছে।

অনিলিখা কাগজটা তুলে নিল, কারণ কাগজটায় যে ভাষায় লেখা তা খুব ইন্টারেস্টিং। অনিলিখার চেনা। প্রাচীন মিশরীয় হরফে লেখা। জিন ফ্র্যাঙ্কোয়িসের লেখা পড়ে প্রথম এ ভাষার ওপর কৌতূহল হয় অনিলিখার। শিখেও ফেলে। প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের হরফে লেখা হত। প্রথম ধরন হল হাইরোগ্লোফিক। এ হরফে মূলত ছবির ব্যবহার হত। এই হরফে লেখা হত প্রাচীন মিশরের স্তম্ভে, মন্দিরে বা কবরে।

দ্বিতীয় ধরনের হরফ হল হাইর‍্যাটিক। লেখা হত ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে, ব্যবসার কাজে প্রধানত এই হরফ ব্যবহার করা হত।

তৃতীয় ধরনের হরফ হল ডেমোটিক। অন্য দুই হরফের থেকে সৃষ্টি এই হরফের। প্রাচীন মিশরে দৈনন্দিন কাজকর্মে, ব্যবসার কাজে প্রধানত এর ব্যবহার ছিল। গল্পও লেখা হত। এ হরফে লেখা সোজা। কিন্তু পড়া খুব শক্ত।

এই কাগজের টুকরোতে লেখা হয়েছে ডেমোটিক হরফে। একটু কষ্ট করেই পড়তে হল অনিলিখাকে।

তাতে লেখা—'আমি যে-কোনও ভাবে তোমাকে বাঁচাব। বাঁচাবই।'

লেখাতে শপথ নেওয়া হয়েছে মিশরের সূর্যদেবতা 'রাহ'-এর নামে।

চোখে জল এসে গেল অনিলিখার। সত্যিই ছেলেকে খুব ভালোবাসত মার্ক। তাকে জোর করে এভাবে অসুস্থ ছেলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাটা একেবারেই উচিত হয়নি। মার্ক হয়তো এই দুর্ভাবনার মধ্যে মনোবল পাওয়ার জন্য সূর্যদেবতাকে উদ্দেশ্য করে লিখে রেখেছিলেন। আজকে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ফেলে দিয়েছেন। তবে...অনিলিখার কপালে একটু ভাঁজ পড়ল। কাগজটাতে ফাউন্টেন পেনে লেখা। মার্ক তো ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতেন না।

অনিলিখা মার্কের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল। বেশি সময় নেই। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। দু-দিনে ফিরে আসতে হলে পুরো ট্রিপটাতেই যে খুব ধকল সহ্য করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। আর বিশেষ করে যখন সে পথে সুমাত্রার বন-জঙ্গল-পাহাড়-সুজাক উপজাতি, এসব আছে।

মেডান। সুমাত্রা—12 অক্টোবর

মেডান। উত্তর সুমাত্রার একটা বড় শহর। শক্তিশালী 'অ্যাসে' সুলতানরা 1873 সাল পর্যন্ত এসব জায়গায় রাজত্ব করত। দীর্ঘ তিরিশ বছরের যুদ্ধের পরে তা ডাচদের অধীনে আসে। তাই শহরময় ডাচ স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়ানো। মেডান অবধি চার্টার্ড প্লেনে এসে মেডান থেকে দুটো গাড়ি নেওয়া হয়েছে। গাড়ির অবস্থা যথেষ্ট ভালো হলেও রাস্তার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। সমুদ্রতীর ধরে গাড়ি উত্তরের দিকে চলেছে।



সুমাত্রার সরকারি টুরিস্ট বোর্ড হল ন্যাট্টাবু। তা, ন্যাট্টাবু থেকে গাড়ি নেওয়ার সময় রাজা লেক তাওয়ার দেখার কথা বলেছে। লেক তাওয়ার দেখার যে বিশেষ লোক হয় না, তা সংস্থার লোকেদের হাবভাব দেখেই বোঝা গেছে। ওরাই বলে দিল যে এ পথে গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। তারপর ওখান থেকেই 'অ্যান্ডি' বলে একজনকে গাইড হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ছোটখাটো চেহারা, চওড়া মিলিটারি গোঁফ। জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরা। তবে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে প্যান্টে নানান ধরনের মেরামতি সেলাই। নেহাত অবস্থার বিপাকে পড়েই অ্যান্ডি গাইড হয়েছে।

বারবার সুনামিতে, ভূমিকম্পে উত্তর সুমাত্রার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক লোক মারা গেছে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষত অনেকটা মুছেও গেছে। পথের দুধারে অনেক রাবার আর নারকোল গাছ। মাঝেমধ্যে বিস্তৃত ধানজমি। কোথাও কোথাও কফির চাষ হচ্ছে। সুমাত্রা কফির জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এখানকার চাষিদের মাথায় বিশেষ ধরনের শোলার টুপি। এক সময় এসব জায়গায় প্রচুর তামাকের চাষ হত। এখানকার তামাকের নাম ছিল বিশ্বময়।

প্যাসোলায় পৌঁছোতে-পৌঁছোতে রাত আটটা বেজে গেল। ঠিক হল ওখানেই রাত্রিবাস। এখানে বড় হোটেল নেই। সাধারণ লোকেরাই বাড়ি ভাড়া দেয়। অনিলিখারা যে-বাড়িতে ভাড়া নিল, সে বাড়ির এক বৃদ্ধা দুদিন আগে মারা গেছে। বৃদ্ধার মৃতদেহ চেয়ারে বসিয়ে রাখা আছে। গায়ে ইকাট নামের এক শুকনো রঙিন কাপড় জড়ানো।

এখানে এরা সব মেরাপু ধর্মাবলম্বী। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনেক খরচ বলে কয়েকজনের কবর এরা একসঙ্গে দেয়। এজন্য অনেক সময় মৃতদেহ বছরের পর বছর বাড়িতেই ফেলে রাখা হয়। অনিলিখা ওদেরকে এরজন্য বেশ কিছু অর্থসাহায্য করল যাতে বৃদ্ধার কবর পরের দিনই হয়ে যায়।

দলের সবাই ক্লান্ত। যে যার মতো শুতে চলে গেল। অনিলিখার তেমন একটা ক্লান্ত লাগছিল না। বাড়ির সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আলাপ করল। বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প শুরু করল, নানান দেশের। ওদের এলাকার প্রধানের সঙ্গে আলাপ হল। প্রধানও অনিলিখাকে নানান স্থানীয় গল্প বলল, যেমন—ওরাং পেনডেকের কথা। এরা হল একধরনের বনমানুষ। দেখতে শিম্পাঞ্জি আর মানুষের মাঝামাঝি। এদের গায়ে নাকি অসম্ভব জোর। টেনে ছোট গাছ তুলে নিতে পারে। তবে এদের দেখা পাওয়া নাকি সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। এদের নিয়ে অনেক গল্প-গাথা আছে, কিন্তু কেউই দেখেনি।

এসব নানান গল্প চলল অনেক রাত অব্দি। ওরা অনিলিখার মতো একজনকে পেয়ে ভারি খুশি। আরও খানিক পরে অনিলিখা যখন শুতে গেল, তখন ও ওদেরই একজন হয়ে গেছে।

উত্তর সুমাত্রা, 13 অক্টোবর

পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ অনিলিখারা প্যাসোলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ—বিকেল হওয়ার আগে যদি পৌঁছোনো যায়। রাস্তার ধারের পাইন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে মাঝেমধ্যেই উঁকি মারছিল সমুদ্র আর সাদা বালুচর। ডিঙি নৌকোগুলোতে কালো পাল। কালো রং এখানে সৌভাগ্যের প্রতীক। তাই চারদিকে কালো রং।

অনিলিখা ইতিমধ্যেই অ্যান্ডির সঙ্গে ভালো আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। অ্যান্ডির কাছ থেকেই জানল যে এখানকার লোকেদের আচার-ব্যবহার খুব অদ্ভুত। এরা শরীরের কিছু অংশে কখনই জল লাগায় না। মুরগির শুধু মাথা আর পা খায়। সমুদ্রের দানবের পুজো করে। তাকে খুশি করতে বাড়ির বাইরে খাবার রেখে দেয়। এসব জায়গায় বেশিরভাগই বাটাক সম্প্রদায়ের। তবে ভাগ্য ভালো এখন আর এরা মানুষ খায় না।

অনিলিখারা বিরুইন পৌঁছোল দুপুর বারোটা নাগাদ। ওখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রার শুরু। দুপুরের খাবার সারা হল একটা ছোট গ্রামে। খাবার চয়েস বেশি নেই। দড়িতে সার দিয়ে বাঁধা বাদুড়। তার স্টু। অনিলিখা আপেল-কলা খেয়ে কোনওরকমে পেট ভরাল। গ্রামের বাড়িগুলোর সামনে কফি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা রাস্তায় গুলি-ডান্ডা খেলছে। ঠিক যেন ভারতেরই ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটা পেরোনোর ঘণ্টাদেড়েক বাদ থেকে পাহাড়ি রাস্তা শুরু হল। আঁকাবাঁকা রাস্তা। ধারে খাদ। পুরো সুমাত্রার পশ্চিম বরাবর ব্যারিসন পাহাড়শ্রেণি। অনেকগুলো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে এই পর্বতশ্রেণিতে। এদের মধ্যে অনিলিখাদের গন্তব্য গেউরেদঙ পর্বত। ওখানেও দুটো আগ্নেয়গিরি আছে।

পথের চেহারা খানিকক্ষণের মধ্যেই বদলে গেল। সরু পাহাড়ি পথের একদিকে খাদ। অন্যদিকে ঘন জঙ্গল। কখনও বা আকাশ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে সুউচ্চ গাছের আড়ালে। দু-ধারের গাছের মধ্যেও শৃঙ্খলার অভাব। নানান আকারের নানান ধরনের গাছ। এ যেন বাচ্চা ছেলের তুলির আঁচর। বাতাসে একটু ঠান্ডা স্যাঁতস্যাতে ভাব। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাঝেমধ্যে রাস্তাই হারিয়ে গেছে নদীর হালকা জলস্রোতে। এ জঙ্গলে আজও বাঘ, হাতি, পাইথন, ভালুক, ওরাং ওটাং সবই আছে। চোরাকাঠের কারবারীদের পাল্লায় পড়ে সুমাত্রার অনেক জায়গায় বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেলেও, এদিকের জঙ্গলে তেমন দাগ পড়েনি। তাই এদিকে এরকম গা-ছমছমে জঙ্গল।

রাজা পুরো পথটাই খুব চুপচাপ। অনিলিখার পাশে বসলেও পুরো পথটা হুঁ-হাঁর বেশি কিছু কথা বলেনি। তবে ও যে অনেকবার এদিকে এসেছে তা নিশ্চিত। তাই ড্রাইভার প্রায় ওরই কথা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে।

বিকেল পাঁচটায় ওরা একটা জায়গায় পৌঁছোল, যেখানে এসে গাড়ি যাওয়ার পথ শেষ হয়ে গেছে। এরপরে হাঁটা পথ গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। হেঁটে এখনও প্রায় তিন মাইলের মতো যেতে হবে। দূরে আগ্নেয়গিরির মুখ দেখা যাচ্ছে। একটা না, দুটো। আর তার দিকে তাকালে—মাঝখানে শুধুই সুমাত্রার আদিম, অকৃত্রিম জঙ্গল।

ডক্টর ন্যাশের এই সময়ে ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে একটু আপত্তি ছিল। শুধু উনি নন, সবারই একটু হলেও দ্বিধা ছিল। সুমাত্রার এসমস্ত জঙ্গলে বাঘ থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুমাত্রার অন্যসব জঙ্গলে বাঘ, হাতি এসব আর দেখা না গেলেও এদিকে এদের থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই প্রবল। রাজাই এ এলাকা সবথেকে ভালো করে চেনে। গাইড অ্যান্ডি আর ড্রাইভাররাও এদিকে কখনও আসেনি। অ্যান্ডি বলল,—ওরাং পেনডেকের দেখা এদিকেই পাওয়া গেছে। যদিও বছরে এক-আধবার।

সুজাক উপজাতি আর ওরাং পেনডেক যে একই জীব, এরকম একটা ধারণা অনিলিখার মনে তৈরি হয়েছে।

রাজা বলে উঠল,—আমরা যদি সুজাক উপজাতির দেখা পেতে চাই, তা হলে এখনই যাওয়া উচিত। হেঁটে যেতে ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। কাছাকাছি কোনও গ্রামও নেই। সব থেকে ভালো হবে গাড়িতে বা ক্যাম্পে রাত না কাটিয়ে, আজ রাতেই গুহা দেখে ফিরে যাওয়া। আমি তো আগেও এসেছি, কোনও ভয় নেই।

কারুর কাছেই এ প্রস্তাবের কোনও বিকল্প নেই। নিশাচর এক উপজাতি দেখতে হলে তো এ সময়েই যেতে হবে। অগত্যা ড্রাইভার দুজন আর অ্যান্ডি গাড়িতেই রইল। অ্যান্ডির শরীর খারাপ লাগছে, ও তাই সঙ্গে যেতে চাইল না।

অনিলিখারা সরু চড়াই পথ ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পায়ের নীচে ঝরা পাতার মচমচ আওয়াজ। রাজা সবার সামনে যাচ্ছে। ওর হাতে একটা বন্দুক। বাকি সবার হাতে টর্চ, জলের বোতল, গাছকাটার ছুরি। গাছপালা সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সবরকম উচ্চতার গাছ আছে। মাটির কাছেও গাছ-আগাছার ভিড়। নরম কাদায় হাতির পায়ের ছাপ। এসব জঙ্গলে হঠাৎ করে সুমাত্রার গন্ডারের মুখোমুখি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যেতে যেতে ওরা একদল ওরাংওটাং-ও দেখল। বেশ আয়েস করে গাছ থেকে

ঝুলতে ঝুলতে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখছিল। তা এভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটে গেল। একফালি চাঁদ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চারদিক আরও মায়াময় করে তুলেছে।

ডক্টর স্টিভেন একবার বললেন,—কী রাজা! এতক্ষণ লাগছে—ভুল পথে চলে আসিনি তো?

রাজা সংক্ষেপে জানাল,—না, না, ঠিক পথেই চলছি। আর আধঘণ্টা বড়জোর।

ওপরের দিকে তাকালে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারাখচিত আকাশ। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে শুরু হচ্ছে ঝিঁঝি পোকার তান। দূরে কোনও ছোট ঝরনার ঝিরঝিরানি শব্দ। রাতের স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে ওই ঝরনার স্রোতের আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। বাঘ একদম কাছে চলে এলেও পায়ের শব্দ শোনার কোনও উপায় নেই। মাঝে মাঝে পাখির ডানার ঝটপটানির আওয়াজ। হঠাৎ এরমধ্যে রাজা বলে উঠল,—এই তো এসে গেছি। দূরে গুহা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় বেশ কয়েকটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে। ওপরের দিকে আরও প্রায় আধমাইল রাস্তা—পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যাতারার পাশে। রাজা সবাইকে টর্চের আলো জ্বালাতে বারণ করল। আলো ওরা সহ্য করতে পারে না। এমনিতেও এতটা পথ হাঁটার পর চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে চাঁদের আলোয় পথ চলতে। গুহার সামনের দিকটা খানিকটা পরিষ্কার। দেখেই বোঝা যায় গাছ-আগাছা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাইরে থেকে গুহার ভেতরের কিছুই বোঝার উপায় নেই। ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাঁদের আলো রাজার জিনসের শার্টের পকেটে গোঁজা পেনের ওপর পড়ে চকচক করে উঠে হারিয়ে গেল। রাজা সবার আগে ঢুকল। তার পেছন পেছন সবাই। অনিলিখা কী যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গুহার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ সামনে দুটো চোখ জ্বলে উঠল। চাঁদের আলোয় একপলক তাকিয়েই অনিলিখা বুঝল যে সামনে—ওর আর গুহার মাঝে একটা হায়েনা। কীরকম একটা জঙ্গুলে হিংস্রতার সঙ্গে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছে। এরা মানুষকে আক্রমণ করে না। তবু অনিলিখা চুপ করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ গুহার মধ্যে থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। ডক্টর ন্যাশের, ডক্টর আজিজের, ডক্টর অ্যালান ডকের, ডক্টর ওয়াকাটার, স্বরাজবাবুর। মুহুর্মুহু আর্তনাদে চারদিকের রাতঘুম ভেঙে গেছে। প্রতিমুহূর্তে একটার পর একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠে ফের স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এক নিমেষে অনিলিখার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সুজাক উপজাতির লোকেরা তাহলে কি নরখাদক? সুমাত্রার নরখাদক বাটাক উপজাতির কথা ও আগেই শুনেছে। আর সবাইকে নিরস্ত্র করে এদের হাতে তুলে দেওয়াটা কি রাজারই প্ল্যান? যাতে ফিরে গিয়ে কেউ এদের কথা কখনও না বলতে পারে। কাউকে না জানাতে পারে।

ভাগ্যিস রাজার বুক পকেটের দিকে নজর পড়েছিল অনিলিখার। আর তাই ও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল। কারণ মার্কের ঘরে খুঁজে পাওয়া ফাউন্টেন পেনে কাগজের ওই লেখা মার্কের নয়, রাজার। যাতে লেখা ছিল 'আমি যে-কোনওভাবে তোমাকে বাঁচাব, বাঁচাবই।' ওটা 'তোমাকে' নয়। 'তোমাদের'-কে হবে, কারণ ডেমোটিক ভাষায় এই দুটো শব্দের মধ্যে কোনও তফাত নেই। অর্থাৎ রাজা বলেছিল যে করে হোক সুজাকদের বাঁচাবে। আর তাই—

তাহলে কি মার্ককেও রাজাই হত্যা করেছে? আর তখনই ওই কাগজটা ওর পকেট থেকে মার্কের ঘরে পড়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে অনিলিখা বুঝল যে সুমাত্রার জঙ্গলের বাঘ ও গন্ডারের থেকেও অনেক বেশি বিপদ ওর খুব কাছেই। গুহার ভেতরে কারুর সাহায্যের জন্য এগোবে কি?...কিন্তু খালি হাতে? না, তার কোনও মানে হয় না। উলটোদিকের জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে শুরু করল অনিলিখা। হঠাৎ, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। পা ঘেঁষে চলে গেল গুলিটা। মাটিতে পড়ে গেল অনিলিখা। কোনওরকমে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে সামনে রাজা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বন্দুক।

—স্যরি অনি। তোমাকেও এদের স্বার্থে মরতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে এ ঘটনার কথা, এদের কথা তুমি গোপন রাখবে। আর আমার কাছে এদের প্রাণের থেকে দামি কিছু নেই।

বন্দুকটা আবার গর্জে উঠল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বাঁদর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজার ওপর। রাজার বন্দুকটা ছিটকে পড়েছে। ও শুয়ে পড়েছে, আর বাঁদরটা ওর বুকের ওপরে। রাজা বাঁদরটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। বাঁদরটা ওর বুক আর পেটের মাংস কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

এ দৃশ্য সহ্য করা অনিলিখার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের সব শক্তি একসঙ্গে করে ও ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ পাশের গাছে ঝড় তুলে কী একটা ওর সামনে এসে দাঁড়াল। ওইরকমই আরেকটা বাঁদর। নাহ, ঠিক বাঁদর নয়। উচ্চতা সাড়ে চার ফুট। অসম্ভব চওড়া কাঁধ। বিশাল চওড়া বুক, শক্তিশালী হাত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পা অপেক্ষাকৃত সরু ও ছোট, সাধারণ মানুষের মতো। কোটরে বসা চোখদুটোতে হিংস্রতার ছাপ। মুখে রক্ত লেগে আছে। গরিলা আর শিম্পাঞ্জির সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও আজকের মানুষের সঙ্গেই সবথেকে বেশি মিল। এরাই তাহলে প্রথম মানুষ! যাদেরকে রাজা বলে সুজাক, এখানকার লোকেরা বলে ওরাং-পেনডেক।

অনিলিখা বুঝতে পারল ওর শেষমুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। ওর অবস্থাও রাজার মতো হতে চলেছে। এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে-পেটে কামড়াতে শুরু করবে মানুষটা। চোখ বন্ধ করে ফেলল অনিলিখা। এক মিনিট কেটে গেল। দু-মিনিট। কই কিছুই হল না তো! অনিলিখা চোখ খুলল সাহস করে। লোকটা উধাও।

তবে কি এরা মেয়েদের খায় না? রাজা বলেছিল যে ওরা মেয়েদের পুজো করে। কিন্তু এটা এসব পর্যালোচনার সময় নয়। আহত পা নিয়েই অনিলিখা বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। শুধু চাঁদের আলোর ভরসায়। ওর মনে হচ্ছিল সামনে যেন কেউ ওর জন্য পথ করে দিচ্ছে। বনজঙ্গল ঝোপঝাড় সরিয়ে সরিয়ে কী যেন ওর আগে আগে চলে যাচ্ছিল। তা না হলে এই রাতে ওর একার পক্ষে পথ চেনা অসম্ভব হত।

নীচে দুটো গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ড্রাইভার নেই। গাড়িতে চাপ চাপ রক্ত। অর্থাৎ, ওদেরকেও রেহাই দেয়নি এই নরখাদকের দল। গাড়ি স্টার্ট করল অনিলিখা। ফেরার পথ ধরল। ফেরার পথে ট্যাবেগাও-তে ও পুলিশ রিপোর্ট লেখাল। ওরাও নরখাদক মানুষের কথা আগে শুনেছে। আর ঠিক এই কারণে চোরাকাঠ শিকারিরা, পামওয়েলের সন্ধানী ব্যবসায়ীরা এখানে ঢোকে না। হঠাৎ করে ওরা কেন ওখানে এসেছিল, তা নিয়ে অনিলিখাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ও ইচ্ছে করেই সুজাক উপজাতির কথা কিছু বলল না। ওরা অনাবিষ্কৃত হয়েই থাক—বেঁচে থাক ওদের মতো করে।

75000 বছর আগে, সুমাত্রা

অবশেষে চোখ মেলল ছেলেটা। গত কয়েকদিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। ওঠার চেষ্টা করল, পারল না। অনেকদিন খাওয়া হয়নি। হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে। সারা গায়ে ক্ষতের চিহ্ন। কোনওরকমে মাথা তুলে চারদিকটা দেখে নিল একবার। এ গুহার মধ্যেও জল ঢুকে গেছে। শুধু সামান্য জায়গা বাকি। গুহার ছাদ আর নীচের জলের স্রোতের মধ্যে বড়জোর দু-হাত ফাঁকা।

ভাগ্যিস উঁচু পাথরটা পাওয়া গিয়েছিল! পাথরটা কোনওরকমে জলস্রোতের ওপরে মাথা তুলে আছে। তবে, তাও কতক্ষণ? বাইরে আর ভেতরে একইরকম অন্ধকার। শুধু জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ। এই বুঝি তেড়ে এল! মেয়েটা-মেয়েটা কোথায়?

এই এক মাসে ও ওরই মতো আরও দুজনকে খুঁজে পেয়েছিল। তারা তাদের মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ওকে অসুস্থ দেখে ফেলে চলে গেছে। শুধু মেয়েটা ছেড়ে যায়নি। এই এক মাস যা খাবার পেয়েছে দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। যেদিন খায়নি, দুজনেই খায়নি। এই যে ওর শরীর এত খারাপ, ওকে তো ফেলে মেয়েটা চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। পাশে বসে থেকেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন কোথায় গেল? নাহ, মেয়েটারই বা কী দোষ! ওর সঙ্গে এই গুহায় আটকে থেকে সেধে মৃত্যু ডেকে আনার তো কোনও কারণই নেই। খানিকবাদে এ গুহাতেও হয়তো জল ঢুকবে। ওর যা শরীরের অবস্থা ও কোনওভাবেই নড়তে পারবে না। জলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। নাহ, যদি চলে গিয়ে থাকে তো ঠিকই করেছে মেয়েটা।

হঠাৎ একটা পাথরের শব্দ এল কাছ থেকে। চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটা। ওই-ওই তো মেয়েটা! পাথর দিয়ে কিছু একটা থেঁতলে মেরেছে। এক হাতে কিছু একটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কিছু একটা ওর মুখে গুঁজে দিল।

আহ, কী সুন্দর! এক টুকরো মাংস। কতদিন বাদে যে এটুকু খাবার জুটল! মেয়েটা হাসছে। ভারি সুন্দর চোখের পাতা মেলে। ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ফোঁটাটা আঙুল দিয়ে মুছে মেয়েটা ওর হাতের মুঠোটা চেপে ধরল। এখনও সব শেষ হয়নি। আমরা বাঁচবই।

কলকাতা, 18 অক্টোবর

—বিশ্বজিৎদা, খবরটা দেখেছ? রুজু বাংলা খবরের কাগজটার তৃতীয় পাতার কোণের দিকটা এগিয়ে দিল। ছোট খবর।

বিশ্বজিৎদা খুব আনমনে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হাতে ধরা একটা বই কাছে দূরে করে নিজের নতুন চশমাটা টেস্ট করছিল, আর গুনগুন করে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজছিল।

—কী হল বিশ্বজিৎদা! খবরটা দ্যাখো।

তবু বিশ্বজিৎদার কোনও সাড়াশব্দ নেই। মিলন পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা রুজুর হাত থেকে টেনে নিয়ে একঝলক দেখে বলে উঠল,—অ্যাঁ, অ্যাসটরয়েডের ধাক্কার সম্ভাবনা! বলিস কীরে!

—কী? কীসের খবর? অ্যাসটেরয়েডে আমাদের সবারই খুব আগ্রহ।

রুজু এবার খবরটা পড়তে শুরু করল—'ঠিক যেমন—হঠাৎ করে দেখা দিয়েছিল অ্যাসটেরয়েড 2015 SX তেমনই আবার হঠাৎ করে হারিয়েও গেল। নাসার বিজ্ঞানীরা রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, যখন দশ দিন আগে এক সাধারণ পর্যবেক্ষকের টেলিস্কোপে এই অ্যাসটেরয়েড ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের চেনাজানা অ্যাসটেরয়েডের মধ্যে এটা ছিল না। পৃথিবী থেকে চাঁদের যতটা দূরত্ব তার এক চতুর্থাংশ দূরত্ব দিয়ে 14 অক্টোবর এই বিশাল পাথরের টুকরোটার যাওয়ার কথা ছিল।

এত কাছ দিয়ে এত বড় পাথর এখনও পর্যন্ত যায়নি। পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মজার কথা হল 14 অক্টোবরের দুদিন আগেই সেটা ভ্যানিশ। ম্যাজিকের মতো উধাও অ্যাসটেরয়েড। কী করে কেউ জানে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানী রন ওয়াইল্ড বলেছেন যে এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে আমরা এখনও মহাবিশ্বের কিছুই বুঝি না।

—দেখেছিস? বলেছিলাম না সেদিন! ডাইনোসরদের মতো আমরাও একদিন অ্যাসটরয়েডের ধাক্কায় শেষ হয়ে যেতে পারি—বলেছিলাম না? প্রতীক সবজান্তার মতো বলে উঠল।

—গাঁজাখুরি গল্প। এতক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সুর ছেড়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—এসব খবর কোথা থেকে আসে জানিস! স্রেফ সাংবাদিকদের মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশ থেকে। হয়তো জায়গাটা রাখা ছিল কোনও

একটা কেচ্ছা কাহিনির জন্য। ঘটেনি সেরকম কিছু। ব্যস, এই খবর! ওই পাথরটা কবে আসবে তাও জানা ছিল না। তাই ভ্যানিশ হলেও কেউ প্রশ্ন করবে না। শুধু তোদের মতো কয়েকটা গজমূর্খ টেবিলে রাখা সিঙাড়া ঠান্ডা করে এসব আলোচনা করে যাবে।

বলে বিশ্বজিৎদা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলে প্লেটে রাখা একটা সিঙাড়া তুলে নিল।

তোমরা যারা আমাদের শনিবারের আসর সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত নও, তাদের বলি—প্রত্যেক শনিবারে উত্তর কলকাতার পুরোনো পাড়ায় রামতনু বোস লেনের একটা বাড়িতে আমরা জনাকুড়ি জমায়েত হই। বেশিরভাগের বয়স কুড়ির নীচে হলেও, বিশ্বজিৎদা, শ্যামলদা, দেবুদা—এরাও আমাদের আড্ডায় যোগ দেয়। আর কালেভদ্রে আসে অনিলিখাদি। অনিলিখাদির এমন এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে যার তুলনা পাওয়া মুশকিল। অনিলিখাদি উচ্চশিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা, সবার বিপদে সবসময়ে এগিয়ে যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। আর কলকাতায় থাকলে হঠাৎ হঠাৎ এ আসরে উদয় হয় বিদেশের নানান ধরনের চকোলেট নিয়ে। তবে তার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ অনিলিখাদির গল্পে। তাই আমরা সবসময় অনিলিখাদির অপেক্ষায় থাকি।

আজকে বিশ্বজিৎদার কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে চটি খোলার আওয়াজ। অনিলিখাদি ঘরে ঢুকল। একমুহূর্তে আমাদের আড্ডার ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা ভ্যানিশ। একটু যেন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হেঁটে চেয়ারে এসে বসল অনিলিখাদি। হাতে দুটো বই, তারমধ্যে একটা অ্যাসটেরয়েডের ওপরে লেখা। আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল,—অ্যাসটেরয়েডের ওপর খুব সুন্দর বই—তোরা পড়িস।

—কী আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে? আমরা এইমাত্র অ্যাসটেরয়েডের পৃথিবীতে ধাক্কা মারা নিয়ে কথা বলছিলাম। মনীশ বলে উঠল।

—এই দ্যাখো। অ্যাসটেরয়েড নিয়ে একটা খবর বেরিয়েছে। সত্যিই কি ধাক্কা মারার সম্ভাবনা ছিল? রুজু কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিশ্বজিৎদা ঠাট্টা করে বলে উঠল,—দাঁড়া, অনিলিখাকে একটু বসতে দে। এতদিন বাদে এল। এসব হল ওর কাছে পুরোনো খবর। অ্যাসটেরয়েডের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার—সব অনিলিখার জানা।

বলে একটু সিরিয়াসভাবে অনিলিখাদিকে ফের প্রশ্ন করল,—তা তোমার এ খবরটার ব্যাপারে কী মনে হয়? পুরো বানানো গল্প, তাই না?

অনিলিখাদি মুচকি হেসে একটু যেন সময় নিয়েই বলে উঠল,—এই একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত। পুরোপুরি বানানো।

